বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনা

A Comparative Study of Buddhist Mystic and Baul Song

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

সানিতা
এম. ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩২
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনা (A Comparative Study of Buddhist Mystic and Baul Song) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পাদিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভ এবং এর অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি এবং কোনো জার্নাল, সাময়িকী, পুস্তক কিংবা কোনো প্রকাশনা আকারেও এই গবেষণাকর্ম বা এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়নি।

সানিতা
এম. ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩২
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সানিতা, রেজিঃ নং- ১৩২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭ কর্তৃক উপস্থাপিত **বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনা (A Comparative Study of Buddhist Mystic and Baul Song)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনা (A Comparative Study of Buddhist Mystic and Baul Song)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পেরে আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার প্রতি। তাঁর মত অভিজ্ঞ এবং সহযোগিতাপূর্ণ শিক্ষকের সাহচর্য ও দিকনির্দেশনায় গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। গবেষণাকার্যের সূচনা থেকে শেষ অবধি তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণার প্রসূত ফল এ অভিসন্দর্ভটি। তাঁর প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. দেবপ্রসাদ দাঁ এর প্রতি। যিনি আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের নেপথ্যে ছিলেন। যাঁর সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের কাজ শুরু করা সম্ভব হত না। শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বিশিষ্ট সুরকার এবং বাংলা খেয়ালের জনক প্রয়াত আজাদ রহমানকে। গবেষণার কাজ চলাকালীন তাঁর বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ পরামর্শ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সংগীত বিভাগের সকল শিক্ষকগণের প্রতি। আমার শিক্ষা জীবনের সকল শিক্ষকগণের প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছি বিশিষ্ট ভাষাবিদ, শিক্ষক, লেখক এবং রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এর প্রতি। যিনি এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদান করার জন্য পালি এন্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নীরু বড়ুয়ার প্রতি ও ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সরকারি সংগীত কলেজের সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. শেখ খালিদ হাসান এর প্রতি। যিনি বিভিন্ন সময়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গবেষক, লেখক এবং সংগীত শিল্পী অরূপ রাহী কে। যাঁর কাছ থেকে সহজিয়া ও বাউল সাধনা ও সাধক সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং সার্বিক সহায়তা পেয়েছি।

শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করছি আমার মা-বাবাকে। সেই সাথে স্মরন করছি আমার একমাত্র ভাইকে যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং আমার চলার পথকে সর্বদা সুগম করেছে। সেই সাথে আমার বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত মা-বাবা এবং বড় ভাই-বোনদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা তাঁরা সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আমার বান্ধবী নীরা ইসলাম এবং লাবণী অধিকারীকে আমার জীবনে এই দুজন ব্যক্তির সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে যাঁকে ধন্যবাদ জানালেও কম হবে, যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় সকল প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি, তিনি হলেন আমার জীবনবন্ধু এস. এম ফখরুল ইসলাম (সহযোগী প্রযোজক, চ্যানেল 24)। তাঁর আস্থা এবং ঐকান্তিকতা সবসময় আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

সানিতা

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

১. প্রস্তাবনা (Introduction)

গানের ভিতর দিয়ে বাঙালির সৃজনশীলতার যে বিপুল বিকাশ, তার স্বরূপকে একান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা সম্ভব নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে এমন সুবৃহৎ প্রেক্ষাপটে বাংলাগানের বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন বাংলগানের যে সকল নিদর্শন আমাদের সামনে রয়েছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গান তাদের মথ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতবাদ সহজযান নামে পরিচিত। 'সহজিয়া' একটি বিশেষ সম্প্রদায় যারা সহজ পথে সাথনা করে। জীব বা জড়ের বাহ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে একটি শাশ্বত স্বরূপ জন্ম লাভ করে। এই শাশ্বত স্বরূপই সহজ। আর এই উপলব্ধির স্বরূপ প্রণালীই হলো সহজপথ। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে বাউল গান একটি বিশেষ সম্পদ। যাকে বৌদ্ধ সহজিয়া গানের নব্য সংস্করণ বলা যায়। ভাবগত দিক থেকে উভয় সংগীতে সাদৃশ্য বিদ্যমান। গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের উৎপত্তি, মূলতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মসাধনা, ভাবসাধনা, নারী ও প্রেম সাধনা, দেহ সাধনা ও গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

২. উদ্দেশ্য (Purpose)

বাংলাগানের প্রাচীন দুটি ধারার একটি হলো বৌদ্ধ সহজিয়া গান ও অন্যটি বাউল গান। একটি প্রাচীনতম ধারা। অপরটি প্রাচীন ও বিশেষ জনপ্রিয় ধারা। দুই ধারার গানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাগানের উৎপত্তি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এদের অবদান ও অবস্থান তুলে ধরার মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

৩. পরিধি (Scope/Importance)

এ গবেষাণাকর্মের মাধ্যমে বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল উৎপত্তি, বিকাশ, তত্ত্ব ও দর্শন, সাধনা, সাংগীতিক রূপ ও সাহিত্য মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব। বাংলাগানের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

৪. গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodolgy)

বৌদ্ধ সহজিয়া গান ও বাউল গানের দর্শন, সাধনা, সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য, সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের জীবন ও রচনা নিয়ে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণকরা হবে। এ সর্ম্পকে বিভিন্ন গ্রন্থ, সেমিনার ও সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ থেকে তথ্য-উপাও সংগ্রহ করে গবেষণাটি রচনা করা হবে ।

৫. অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Proposed Structure)

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের উদ্ভব ও বিকাশ

সহজিয়া একটি বিশেষ সম্প্রদায়। যারা সহজ পথে সাধনা করে। সহজ শব্দের অর্থ যা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায়। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা- অর্চনা, ব্রতনিয়ম শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা দিলে তাদেরই একটি অংশ উপলব্ধি করে যে, এসব শাস্ত্রাচার পালন নিরর্থক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনায় তাকে উপলব্ধি করলেই মুক্তি লাভ করা যায়। এভাবেই পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়।

বাউল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও সৃজনশীল সাধকদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সম্প্রদায়টি মূলত দেহসাধনা করে এবং গানের মাধ্যমেই দেহসাধনার কথা প্রকাশ ও প্রচার করে। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ও নাথ ধর্মের সাথে বাউল সাধনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাউল সাধনার পূর্ণাঙ্গ উদ্ভব ও বিকাশ কাল হিসেবে সাধারণত ১৪৮৬ খ্রি. হতে ১৫৩৪ খ্রি. বর্তমান চৈতন্যদেবের সময়কে শনাক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্ব

সহজিয়া সাধনায় দেহত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেহকে সামনে রেখেই তারা তাদের সাধনা করে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের বিশ্বাস,সাধনার যিনি লক্ষ্য তিনি জ্ঞান স্বরূপ। তাঁর অবস্থান দেহের মধ্যেই, দেহের বাইরে নয়। সুতরাং দেহকে বাদ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। জানা যায়, কেবল গুরুপদেশ ও সহজ সাধনায়। তাই সহজ সাধনায় দেহের গুরুত্ব অনেক। দৈহিক সাধনার মধ্য দিয়েই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়। এটাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বের মূল কথা।

বাউল গানের সাধনতত্ত্ব

বাউল লোকসম্প্রদায়ের একটি সাধন গোষ্ঠী। বাউলরা দেহভিত্তিক সাধনার অনুসারী। বাউল সাধনা নারী পুরুষের যোগ সাধনা। জ্ঞান মার্গীয় একক যোগ সাধনাও রয়েছে। বাউল গানে নানাতত্ত্ব কথা রয়েছে। যেমন দেহতত্ত্ব, গুরুবা মুর্শিদতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব। এ পর্যায়ে বাউল গানের সাধনতত্ত্ব ও বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের ভাষা, সুর বৈচিত্র্য ও ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান এক প্রকার সাংকেতিক ভাষায় রচিত। এতে ব্যবহৃত বহু শব্দের আপাত অর্থ এক প্রকৃত বক্তব্য অন্য। এই ভাষাকে সন্ধাভাষা বা আলো আঁধারীর ভাষা বলা হয়। বাউল গান বাউল সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে রাগ দৈন্য ও রাগ প্রবর্ত। এই রাগ শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ নয়। সাধন ভজনের রাগ। এখানে রাগ বলতে অভিমান এবং প্রেমের নিবিড়তা বোঝায়। বাউল গানে একতারা, দোতরা, ঢোলক, বাঁশি, খমক, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে রচয়িতাদের অবদান

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান এক প্রকার বৌদ্ধ ধর্ম সংগীত ও সাধনা সংগীত। এর ভিতর দিয়ে শাখা প্রশাখা বিভক্ত বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রাচার আশ্রিত রূপটিই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ গানের ক্ষেত্রে রচয়িতাদের

Dhaka University Institutional Repository

অবদান অপরিহার্য। রচয়িতাদের মধ্যে ভুসুকুপা, কাহ্নুপা, সরহপা, শান্তিপা, শবরপা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সহজিয়া ধর্মমতে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা ও কামরূপের অধিবাসী ছিলেন বলে সহজিয়া সাধনতত্ত্বে পূর্ব ভারতীয় জীবনাচার প্রধান্য পায়।

বাউল গানে বাউল সাধকদের অবদান

বাউল গানের উদ্ভব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাউল গানের বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তায় বাউল সাধকদের অবদান অনস্বীকার্য। বাউল সাধকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম লালন সাঁই। তিনি তাঁর বিপুল সংখ্যক গানের মধ্য দিয়ে বাউল মতের দর্শন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেন। এছাড়াও বাউল সাধকদের মধ্যে সিরাজ সাঁই, পাঞ্জুশাহ্, শীতালং শাহ, দুদ্দু শাহ প্রমুখ সাধকগন বাউল গানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

উপসংহার

সমগ্র গবেষণার মূললক্ষ্য বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাগানের ধারায় দুই গীতরীতির নিজ নিজ অবস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে এবং বাংলাগানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র	ii
প্রত্যয়নপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
সারসংক্ষেপ	v
সূচিপত্র	viii
ভূমিকা	০১
প্রথম অধ্যায়ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের উদ্ভব ও বিকাশ	০৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের সাধনতত্ত্ব	২৬
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের ভাষা, সুর বৈচিত্র্য ও ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানে রচয়িতাদের অবদান	৬০
উপসংহারঃ	**৭৭**
গ্রন্থপঞ্জিঃ	**৭৮**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গানের মাধ্যমেই মূলত বাঙালি জাতির সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন বাংলাগানের নিদর্শন গুলোর মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়াগান সর্বাগ্রগণ্য। বৌদ্ধ দর্শন যেমন পৃথিবীর ধর্ম দর্শনের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, তেমনই বৌদ্ধ সহজিয়াগান ও সাধনাতত্ত্ব বাংলা সংগীতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার মূল বিষয় দেহবাদ বা দেহতত্ত্ব। বৌদ্ধ সহজিয়াগানের এই সাধনতত্ত্ব বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতধারা বাউল গানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সহজিয়া এমন একটি বিশেষ সম্প্রদায় যারা সহজ পথে সাধনা করে থাকে। এই সহজ সাধনায় দেহের গুরুত্ব সর্বাধিক। দেহকে অবলম্বন করেই সাধনা করতে হয়। দেহকে বাদ দিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা কখনওই সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনার মূল ভিত্তি দেহ সাধনা। কায়াসাধনা হল বৌদ্ধতন্ত্রের মূল সাধনা। দেহকে অবলম্বন করে সাধনা করলেই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব। সহজ সাধকগন দেহকে ভিত্তি করেই ধর্ম ও সাধনার তত্ত্বের বিশেষ প্রতিপাদন ঘটিয়েছেন। সহজিয়া সাধকগণ বিশ্বাস করেন, একজন সাধকের পরম আরাধ্য বিষয় হল বোধিচিত্ত বা মহাসুখ। সাধনার মাধ্যমে প্রজ্ঞারূপ শূন্যতা এবং উপায়রূপ করুণা সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলেই এই মহাসুখ লাভ করা যায়। দেহের অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনেই সহজানন্দের অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়া সধনায় সাধকগন এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণাকে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। দেহের মধ্যে তাঁরা চারটি চক্রের অবস্থান কল্পনা করেছেন। সিদ্ধাচার্যগণ বিভিন্ন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন এই সাধন প্রণালীকে প্রকাশ করার জন্য। সাধনার প্রধান অবলম্বন দেহ। এই দেহকে কোথাও নগরী (দেহনঅরী), কোথাও রথ, কোথাও বীনা আবার কোথাও মায়াজাল রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সহজানন্দ লাভের একমাত্র উৎস হল এই দেহ।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা থেকে উৎসারিত অপর একটি সাধনার নামবাউল সাধনা। এটি মিথুনাত্মক যোগসাধনা। বাউল গানের সাধনতত্ত্বেও দেহতত্ত্ব প্রধান। বাউল সাধনায় বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব ও মুসলিম সকল ধর্মেরই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। বাউল সাধনাও দেহবাদী সাধনা। দেহই বাউল সাধনার প্রধান আশ্রয়স্থল। দেহকে আশ্রয় করেই তাঁরা মনের মানুষের সন্ধান করে থাকেন। বাউল সাধনার ক্ষেত্রে যোগ, মৈথুন এবংগুরু এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের যে সাধনতত্ত্ব তারই ঐতিহাসিক ক্রম পরিনতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বাউল সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল সকল সম্প্রাদয়ই দেহচর্চাকেই সাধনার মূলব্রত হিসেবে নিয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচয়িতাগণের মধ্যে লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুপা, চাটিলপা, ভুসুকুপা, গুণ্ডরীপা, কাহ্নপা, কম্বলাম্বরপা, শান্তিপা, ডোম্বীপা, মহীধরপা, বাণীপা, শবরপা, সরহপা, আর্যাদেবপা, ঢেণঢণপা, ভাদেপা, দারিকপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, ধামপা, লাড়ীডোম্বীপা, জয়নন্দীপা, তন্ত্রীপা অন্যতম। তাঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।বাউল গানের ক্ষেত্রেও বাউল সাধকগণের অবদান অসামান্য। বর্তমানে বাউল গান যে এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার নেপথ্যে রয়েছে বাউল গানের রচয়িতাগণ। বাউল সাধনা ও দর্শন একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। বাউল সাধকগণ তাঁদের সাধনার বানী গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং জনমানসে প্রচার করার প্রচেষ্টা করেছেন। এই গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা এবং গানের ধারা প্রসূত একটি নব্য ধারা বাউল সাধনা ও গানের উদ্ভব এবং বিকাশ থেকে শুরু করে সাধনতত্ত্ব, সুর বৈশিষ্ট্য, ভাষা, বাদ্যযন্ত্র এবং রচয়িতা সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এই দুই ধারার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

পৃথিবীর ধর্মদর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধদর্শন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় সেটিই মূলত বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধদর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই ধর্মদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী প্রথমে মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর তৃতীয় সংগীতির মাধ্যমে বাণীসমগ্র সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক তিনটি পিটক বা গুচ্ছতে সংকলিত হয়ে ত্রিপিটক নামে আখ্যায়িত হয়। বুদ্ধের অনুগামী ভিক্ষুসংঘের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভিক্ষুদের মধ্যাকার মতবিরোধের কারণে তাঁর মহাপরিনির্বাণের একশ বিশ বছরের মধ্যে তাঁরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কালের বিবর্তনে একাধিক সম্প্রদায় দুটি প্রধান শাখা হীনযান তথা স্থবিরবাদ বা থেরবাদ এবং মহাসাংঘিক বা মহাযানে উপনীত হয়। কালপরিক্রমায় বৌদ্ধধর্মে হীনযান এবং মহাযান সম্প্রদায় দুটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে হীনযান বা থেরবাদ প্রসার লাভ করেছে এবং নেপাল, তিব্বত, চীন, ভূটান, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, হংকং, সিংগাপুর, ম্যাকাও প্রভৃতি দেশে মহাযান শাখার বিকাশ ঘটেছে। বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের মূল ভিত্তি হল সাধনা। বুদ্ধ তাঁর বাণী, উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে কিছু মুল্যবান দার্শনিক তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সাধনার অনুশীলন নিয়ম বা পদ্ধতি বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিকট উপস্থাপন করে গিয়েছেন। এই পদ্ধতি কালের বিবর্তনে ধর্মগ্রন্থ গুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ উদ্‌ঘাটন করা। তিনি বলতেন: "দুঃখ মুক্তি তথা নির্বাণই যেখানে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-সেখানে দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা শুধু অর্থহীন নয় মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ তত্ত্বালোচনায় মুক্তিও মিলবে না; বরং তত্ত্বালোচনাকারীরা কেবল তত্ত্বের জালেই আবদ্ধ হয়ে পড়বেন।"[১]

পরবর্তীকালে বুদ্ধের বাণীর উপর ভিত্তি করে অষ্টাদশ নিকায় বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। এই অষ্টাদশ নিকায় বা সম্প্রদায় হতে থেরবাদ বা মহাযান নামে বিশেষ দুইটি শাখা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে থেরবাদ মহাযান শাখা বা সম্প্রদায় হতে বৈভাষিক, সৌত্রান্ত্রিক, মাধ্যমিক শূন্যবাদ ও যোগাচার বিজ্ঞানবাদ নামক আরও চারটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মাধ্যমিক শূন্যবাদ ও যোগাচার বিজ্ঞানবাদ মতের অনুসারীগণ নিজেদেরকে মহাযানী হিসেবে গন্য করতেন এবং বৈভাষিক ও সৌত্রান্ত্রিক মতের অনুসারীগণ হীনযানী মনে করতেন। তবে প্রধান শাখা হিসেবে হীনযান ও মহাযানই সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধতা লাভ করে। হীনযান ও মহাযান মতে কিছু মৌলিক মতপার্থক্য পরলক্ষিত হয়। যেমনঃ হীনযানীদের মতে পৃথিবীতে মানুষ একা এবং স্বতন্ত্র প্রাণী। তাঁরা নিজ নিজ প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভে বিশ্বাসী। তাঁদের কাছে একমাত্র বুদ্ধপূজা ব্যাতীত পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনীয় নয়। অপরদিকে মহাযানীরা উদারপন্থী। সর্বসাধারণের মুক্তি ও আনুকূল্য মহাযানীদের মূল লক্ষ্য। তাঁরা সার্বজনীন নির্বাণ লাভে বিশ্বাসী। মহাযানী মতে ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা অত্যাবশ্যকীয়। বর্তমানকালে বৌদ্ধমতে থেরবাদ ও মহাযান এই দুই শ্রেণী বিভাজন থাকলেও আর্ন্তজাতিকভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ। সবাই এশটি বিশেষ সংস্থা The World Fellowship of Buddhists (WFB) এর অধীনস্থ। এই সংস্থায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সাধারণ বৌদ্ধ উভয়ই সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অবস্থিত।[২]

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা বাসম্প্রদায় কীভাবে সৃষ্টি হয় তার একটি ধারণা ছকাকারে উপস্থাপন করা হল।[৩]

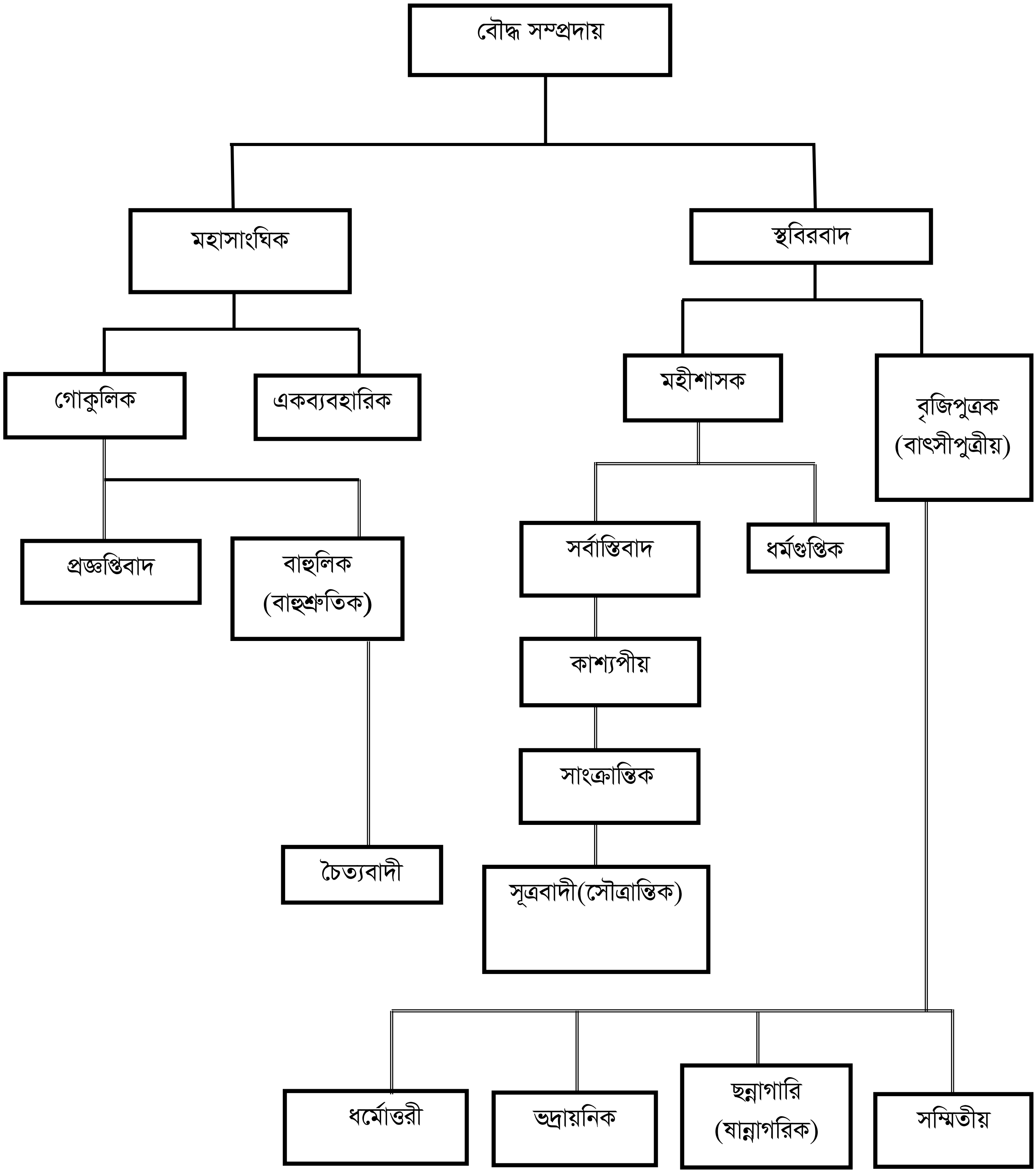

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন মতবিভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি হতে থাকে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের চারশত থেকে পাঁচশত বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের যখন চরম সমৃদ্ধি ঠিক তখনই কয়েকজন খ্যাতিমান আচার্য বৌদ্ধ ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। তাঁদের ধারণা পূর্ববর্তী আচার্যগন বৌদ্ধ ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্ব তুলে ধরতে পারেননি। বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব, দর্শন ও জ্ঞান সকলের সামনে তুলে ধরাই হল প্রকৃত ধর্ম প্রচার। বুদ্ধের বাণী যদি আত্মস্থ না করা যায় তাহলে ধর্ম চর্চাই বৃথা। তাই নতুন আচার্যগন নতুন মতকে 'মহাযান' এবং পূর্ববর্তী আচার্যদের মতকে 'হীনযান'নামে আখ্যায়িত করেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের দিকে দুই ভাই অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর হাত ধরে বৌদ্ধ মহাযান মত পরিব্যপ্তি লাভ করে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু উভয়ের জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপূত্রে হলেও তাঁদের জ্ঞান চর্চা ও শাস্ত্র রচনার কেন্দ্র ছিল অযোধ্যায়। এই সময়ই যোগাচার মতের সূত্রপাত ঘটে। যোগাচার মত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এসে ধর্মপাল নামক একজন আচার্যের ছোঁয়া পায়। যিনি ছিলেন নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে একজন। তিনি শুধু বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক আলোচনা নিয়েই জ্ঞান চর্চা ও সাধনা করেননি। তিনি জ্ঞান চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার ধারা প্রসারিত হয়েছিল। নালন্দা মহাবিহার ছিল জ্ঞান চর্চা ও ধর্মীয় সাধনার পীঠস্থান।[৪]

পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের মাঝে পরিব্যাপ্ত গুহ্য দেহবাদী সাধনা ও ধর্মীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করে আচার্যগণের মনে এক নতুন ধারণার উদয় হয়। এই নতুন সাধন ধারা তন্ত্রযান নামে পরিচিত লাভ করে। তন্ত্র সাধনা ও বৌদ্ধ দর্শনকে মিলিয়ে নতুন একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হলেও সমাজে তন্ত্র সাধনার গুহ্য প্রক্রিয়াটি রয়েই গেল। এরই সাথে আরও তিনটি মতের উদ্ভব ঘটে এবং বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান নামে পরিচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারা রচিত। চর্যাপদের রচনাকাল হিসেবে খ্রিষ্টীয় নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতককে ধরে নেয়া হয়। তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মকে সর্বজন সম্মত ও বোধগম্য করে তোলার জন্য পুঁথিগুলো রচনা করেছেন। সহজ সাধকগণ বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকে নিরর্থক বলে মনে করতেন এবং তাঁরা পূজা-অর্চনা ও মন্ত্র জপেরও বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরহ পা বলেন-

অইরি এহি উদ্দুলিঅ চ্ছারেঁ।

সীমসু বাহিঅ এ জড় ভারেঁ।

ঘরহী বইসী দীবা জালী।

কনেহিঁ বইসী ঘণ্ড চালী ॥

অক্‌খি নিবেসী আসন বন্ধী।

কন্নেহিঁ খুসুখুসাই জন ধন্ধী ॥

অর্থাৎ মিথ্যাচারীতা ও ভস্মলেপনে শিস্যকে বিপথে পরিচালিত করে। ঘরের কোনায় বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে মিথ্যা পূজার্চনা শেখানো হয়। চোখ স্থির রেখে আসনে বসে ধন্ধজনেরা খুসখুস করে কুমন্ত্রণা দেয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ মূলত মহাযান ধর্মমতের একটি পরিবর্তিত রূপ। যেহেতু মহাযানীরা উদারপন্থী তাই তাঁদের উদারতার কারণে অনেক পার্বত্য ও আরণ্যক আদিবাসী সমাজের মানুষ এই ধর্মমতে দীক্ষিত হয়। এমতবস্থায় বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাব প্রবেশ করে যেখানে ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, প্রভৃতি অলৌকিক সত্তা ও মন্ত্র-তন্ত্রের উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও এই তান্ত্রিক প্রভাব তারা বর্জন করতে পারেনি। মহাযানীদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক উদারতা ছিল প্রখর। এই মতে নানা শ্রেণীর লৌকিক মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে এখানে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এদের এক শ্রেণী হল বজ্রযান। বজ্রযানীদের ধারণা নির্বাণের পরে আরও তিনটি অবস্থা- শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ বিদ্যমান। শূন্যতার পরম জ্ঞানকে বোধিচিত্ত বলা হয়। বজ্রযানে গুরুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রদর্শিত পথে সাধনা করতে পারলেই বোধি লাভ করা সম্ভব।[৬]

বৃহত্তর অর্থে মহাযান ধর্মমত, সেটিই পরবর্তীকালে বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই সকল মতের মূল ভিত্তি হল যোগ ও তন্ত্র। যোগ ও তন্ত্র প্রায় সকল মতবাদকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যে সকল সাধক আধ্যাত্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত মনে করেন, সে সকল সাধকের সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে তন্ত্র বা যোগ। বংলাদেশে পাল আমলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে। আদি অনার্য-সংস্কার ব্রাক্ষণ্যমত এবং মহাযান ধর্মমতের সংমিশ্রণে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান ও সহজযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ ও গুহ্যপ্রক্রিয়া সকল মতের মূল ভিত্তি। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রজ্ঞা ও উপায় নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের প্রচলন কবে তা সঠিকভাবে ধারণা করা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে: "বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে, বুদ্ধই সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য মুদ্রা ও মন্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করেন।"[৭]

মন্ত্রযান হল মহাযান ধর্মমতের একটি বিশেষ শাখা। এটি মহাযান মতের প্রথম দিককার স্তর। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ মন্ত্রকে অবলম্বন করে সাধনা করে থাকেন। মন্ত্রের মধ্যমে সাধনা করে মুক্তি লাভ করাই মন্ত্রযানীদের লক্ষ্য। তাঁদের নিজস্ব ধর্মাচার ও বিশেষ পূজাপদ্ধতি ছিল। সাধকগণ মায়া ও মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। মন্ত্র সাধনাই তাঁদের একমাত্র সাধনা। মন্ত্রযানীদের মূল প্রেরণা হল মন্ত্র এবং সেই মন্ত্র থেকে ধারণী ও বীজ। এই মন্ত্রযানী সম্প্রদায় প্রাচীন মহাযানী ধারণার মূল ভিত্তি মাধ্যমিক শূন্যবাদ, যোগাচার বিজ্ঞানবাদ কিছুই বুঝতেন না। তাঁরা মন্ত্রযানের এই নতুন ধারণাকেই সহজ ও সত্য বলে মনে করেছেন। তাঁরা ধারণা করতেন মন্ত্র শক্তির সাহায্যে সাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে দমন করে সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করতে পারলেই একজন সাধক পরমজ্ঞান লাভ করতে পারবেন। এই সাধনায় সাধকের বোধিচিত্তকে মন্ত্র শক্তির সাহায্যে স্থায়ী করা যায়। ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত বলেন: "খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলো রচিত হতে থাকে। এসময় বৌদ্ধ ক্ষান্তি-পারমিতা, দান-পারমিতা প্রভৃতি তত্ত্ব দেব-দেবীরূপে কল্পিত হয়ে প্রমূর্তরূপে পূজা পেতে থাকেন। ধারণী বা বীজমন্ত্রও এ সময় থেকে রচিত হয়।"[৮] মন্ত্রতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সংমিশ্রণ ঘটে এবং এর দার্শনিক ভিত্তি হয় প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব। যার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়ে পাল আমলে তিনটি বিশিষ্ট উপমত বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের উদ্ভব ঘটে। "নাগার্জুনের মতে শূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। এ মত পরে বসুবন্ধুরও সমর্থন পায়। তিনি বলেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা আর এই শূন্যতাই নির্বাণ। অর্থাৎ বাহ্যত সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব মায়ামাত্র-ভ্রমস্বরূপ- এটি অবিদ্যাজাত।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার তান্ত্রিক ধর্মের বিবর্তন ছক আকারে প্রকাশ করা যায় এভাবে।[১০]

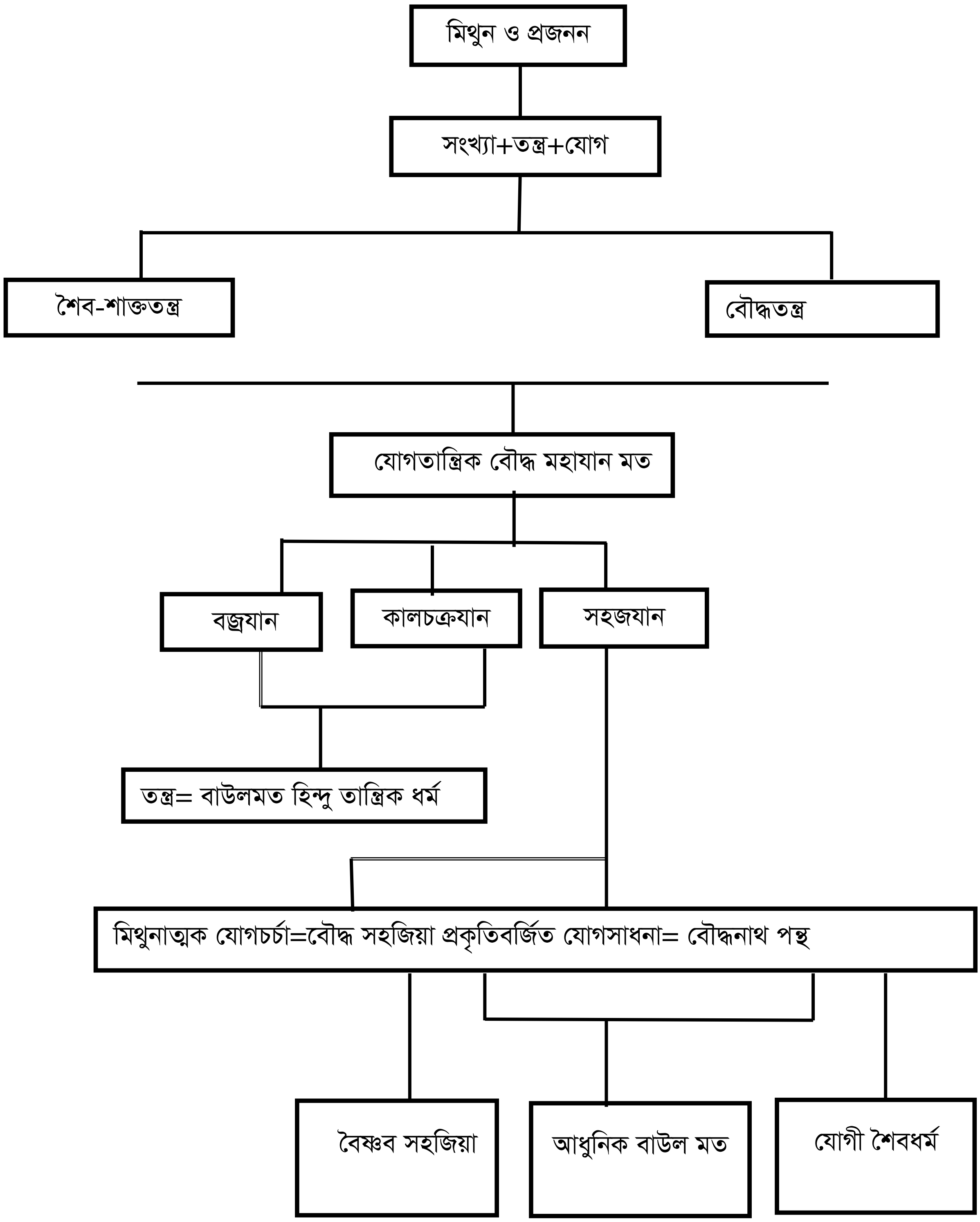

Dhaka University Institutional Repository

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে কালচক্রযান একটি বিশেষ সাধন পদ্ধতি। প্রতিনিয়ত কালের চক্রেই আবর্তিত হচ্ছে সবকিছু। মানুষের জন্ম এবং দুঃখ-কষ্ট, জরা মৃত্যু ভোগ কালচক্রের মাধ্যমেই আবর্তিত হচ্ছে। সাধনার মাধ্যমে নিজেকে কালচক্রের প্রভাব মুক্ত করতে পারলেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। যোগ সাধনার মাধ্যমে দেহের নাড়ীগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দৈহিক প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারলে কালের প্রভাব এড়ানো সম্ভব। কালকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে এহেন সাধন পদ্ধতিতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি, বার প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায়।[১১] কালচক্রের অনুসারীরা কালচক্রকে আদিবুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের ধারণা কালচক্রই সবকিছুর নিয়ামক। তাঁদের প্রধান সাধনা কালচক্রের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা। সমগ্র পৃথিবী নিয়ত চলমান। এই গতির বিবর্তনই হল 'কাল'। মানুষের জীবনও একটি গতিশীল চক্রে আবর্তিত। কালচক্রযানীরা একে প্রাণক্রিয়া নামে আখ্যায়িত করেছেন। তারা যোগ সাধনার মাধ্যমে এই প্রাণক্রিয়াকে নিরস্ত করার সাধনা করেন।[১২]

ড. আহমদ শরীফ রচিত '*বাউলতত্ত্ব*' নামক গ্রন্থটিতে কালচক্রযান প্রসঙ্গে এভাবে মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে:

> "বজ্রযানের সঙ্গে কালচক্রযানের মৌলিক কোন তফাত নেই। কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। অর্থাৎ এখানে 'কাল'-এর উপরেই অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা 'কাল ঘসতি ভূতানি'। কালচক্র হচ্ছে- শূন্যতা এবং করুণার তথা প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়সত্তা। কালকে জয় বা অতিক্রম করে চিরন্তন বোধিচিত্ত লাভ তথা জন্ম ও মৃত্যু (উৎপত্তি ও ক্ষয়) নিরোধক শক্তিলাভই এ সাধনার লক্ষ্য। তাই কালচক্র বুদ্ধের জনকস্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায়ের ধারক। (বিমলপ্রভা- বাংলার বাউল গান গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫) 'সাধন সম্বন্ধে কালচক্রযানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়' অভয়াকর গুপ্ত 'কালচক্রাবতার' গ্রন্থে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি' প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধতন্ত্রে- বজ্র ও কালচক্রযানে- তুকতাক-উচাটন-বশীকরণ-মারণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারাদি ছিল।"[১৩]

কালচক্রযানের একটি পুঁথি নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয় যার নাম 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'। এই পুঁথিটির অপর নাম 'বিমলপ্রভা'। টীকাকার ছিলেন সুচন্দ্র। কালচক্রযানের অপর একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অভয়াকরগুপ্ত। তিনি পাল বংশীয় রাজা রামপালের সমসাময়িক। ধারণা করা হয় তিনি বাঙালি। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'বুদ্ধকপালতন্ত্রটীকা'।

বিমলপ্রভা কালচক্রের বর্ণনায় কালচক্রের কিছু দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়:

নমঃ শ্রীকালচক্রায় শূন্যতাকরুণাত্মনে।

ত্রিভবোৎপত্তিক্ষয়াভাব জ্ঞানজ্ঞেয়ৈকমূর্তয়ে ॥

উৎপাদব্যয়বর্জিতোহক্ষরসুখো হাস্যাদিসৌখ্যোজঝিতঃ।

বুদ্ধানাং জনকস্ত্রিকায়সহিতঃ ত্রৈকল্যসংবেদকঃ।

সর্বজ্ঞঃ পরমাদিবুদ্ধঃ ভগবান বন্দেতমেবাদ্বয়ম ॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কালচক্র হচ্ছেন শুন্যতা এবং করুণা উভয়ের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁর মধ্যে ত্রিজগতের উৎপত্তি ও ক্ষয় বলতে কিছুই নেই। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সেখানেই মিলিত হয়েছে। সাকার ও নিরাকার ভাবাপন্ন ভগবতী প্রজ্ঞা শক্তিরূপে কালচক্রের সাথে সংযুক্ত হয়। কালচক্র সৌখ্যসম্পন্ন এবং তাঁর এই সুখভাবের উৎপত্তি বা ক্ষয় নেই। তিনি ত্রিকাল ও ত্রিকায়ে নিহিত, সমস্ত বুদ্ধের জ্ঞান স্বরূপ। তিনি সর্বজ্ঞ আদিবুদ্ধ।[১৪]

বজ্রযানে পূজা পদ্ধতিকে বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছে। পূজা পদ্ধতিটি বাদ দিলে বজ্রযান ও অন্যান্য যানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বজ্রযানে দেবদেবীর সংখ্যাও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বজ্রযানের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জ্ঞানসিদ্ধিতে' উদ্ধৃত হয়েছে, 'বোধিচিত্তং ভবেৎ বজ্রং'। অর্থাৎ, বোধিচিত্তই হচ্ছে বজ্র। বোধিচিত্ত হচ্ছে চিত্তের এমন একটি অবস্থা যেখান থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব। একজন সাধক কঠোর সাধনার মাধ্যমে যখন বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হন তখন সেটি হয় বজ্রের মত কঠিন, অবিচল ও অভেদ্য। যার ফলে যে সকল সাধক বা মহাপুরুষগণ বুদ্ধত্বলাভ করেছেন তাঁদেরকে বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যে আসনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন সেই আসনকে বজ্রাসন বলা হয়ে থাকে। গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে যে আসনে উপবিষ্ট হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেটিও বজ্রাসন নামে পরিচিতি পেয়েছিলো। বোধিচিত্ত যখন বজ্র স্বভাবসম্পন্ন হয়, তখন একজন সাধক সাধনায় বোধিজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন।

'জ্ঞানসিদ্ধি' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

সর্বতথাগতং জ্ঞানং বজ্রযানমিতি স্মৃতং।

তথাগত বা বুদ্ধগণ যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাকে বজ্রযানে তথাগত জ্ঞান বলা হয়। পারমার্থিক সত্যই হল 'তথতা'। এই সত্যকে লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বুদ্ধরা সেই পারমার্থিক সত্য নিয়ে জন্মলাভ করেন তাই তাঁরা 'তথাগত'। বজ্রযানের মুল প্রতিপাদ্য হল জ্ঞান। বজ্রযানী সাধকগন সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। এটি ছিল গুহ্য সাধন পক্রিয়া। এই সাধন পদ্ধতিতে 'মন্ত্র মুদ্রা ও মণ্ডল' প্রাধান্য পেয়েছিল। তান্ত্রিক সধকগণ বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে চরম সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই সাধকগণ মন্ত্র মুদ্রা ও মণ্ডলের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন। সাধনায় সকল সাধকের জন্য এক মন্ত্র প্রযোজ্য নয়। যার ফলে সাধকগণের কুল নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়।

হে বজ্রতন্ত্রে কুলের বিশদ বিবরণ রয়েছে:

কুলানাং পঞ্চভুতানাং পঞ্চস্কন্ধস্বরূপিনাং ।

কুল্যতে গম্যতেহনেনেতি কুলমিত্যভিধীয়তে।

বৌদ্ধ মতানুসারে পঞ্চসন্ধই সংসারের বীজস্বরূপ। এ পঞ্চসন্ধকে দমন করতে না পারলে পুনর্জন্ম , সংসার ও দুঃখকষ্ট অবধারিত। এই পঞ্চস্কন্ধ থেকে উৎপন্ন শক্তিই হচ্ছে কুল। এ পঞ্চকুলের নাম যথাক্রমে- বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। যে সকল সাধকগণ তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী দীক্ষা গ্রহন করে সাধনায় অগ্রসর হয়ে কুল লাভ করেন, তাঁদেরকে কুলীন বলা হয়। বজ্রযানে কুলীন ব্যতীত অন্য কেউ পরমার্থ লাভে সক্ষম নয়।[১৫]

বজ্রযানে 'মহাসুখ' বা সহজানন্দ লাভই একজন সাধকের মূল লক্ষ্য। মহাসুখের দুটি চরিত্র প্রাধান্য পায়। যার একটি হল 'শূন্যতা'। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাথে বিশ্বগত রূপ-রস-ধ্বনি-গন্ধ-স্পর্শের সমন্বয়ে আমাদের মনে যে অনুভূতি বা বাসনার সঞ্চারণা ঘটে, তার পূর্ণ নিষ্কাশন। এটি একটি বোধ-বেদনা-আবেগ-অনুভবশূন্য অবস্থা। তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের মূল প্রজ্ঞা বজ্র হওয়ার ফলে তান্ত্রিক বিশ্বাস ও সাধনধারাকে বজ্রযান বলা হয়। মহাযান সাধনার একটি বিশিষ্ট রূপ হল বজ্রযান। সাধারণত মহাযান সাধনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বোধিচিত্ত লাভ করা।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর '*চর্যাগীতিকা*' বইটিতে বোধিচিত্ত সম্পর্কে লিখেছেন এভাবে: "সংস্কার মুক্ত চিত্তের প্রজ্ঞা বা জ্ঞান।"[১৬] তিনি আরও বলেন:

> "তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগসাধনা চারটি চক্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এই চারটি চক্রের প্রথম তিনটি 'কায়া'বা অস্তিত্বের প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছে। একটি চক্রের নাম 'নির্মাণচক্র' যার স্থান হচ্ছে নাভিমূলে, অন্যএকটি 'ধর্মচক্র' যার স্থান হৃদপিণ্ডে।তৃতীয় চক্র হচ্ছে 'সম্ভোগচক্র' যার স্থান হচ্ছে কণ্ঠদেশে, চতুর্থ চক্রের নাম হচ্ছে এ চক্রের স্থিতি হচ্ছে মস্তিষ্কে। এটাই হচ্ছে 'বোধিচিত্ত' লাভের কেন্দ্রবিন্দু। একজন সাধক তখনই মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে যখন সে আয়ত্ত করতেপারে 'মহাসুখচক্র'।"[১৭]

বজ্রযানে 'মহাসুখ' বা সহজানন্দ লাভই একজন সাধকের মূল লক্ষ্য। মহাসুখের দুটি চরিত্র প্রাধান্য পায়। যার একটি হল 'শূন্যতা'। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাথে বিশ্বগত রূপ-রস-ধ্বনি-গন্ধ-স্পর্শের সমন্বয়ে আমাদের মনে যে অনুভূতি বা বাসনার সঞ্চারণা ঘটে, তার পূর্ণ নিষ্কাশন। এটি একটি বোধ-বেদনা-আবেগ-অনুভবশূন্য অবস্থা। দ্বিতীয়টি হল 'করুণা'। 'করুণার' ধারণাতেই বৌদ্ধদর্শন সম্পূর্ণরূপে মানবিক ও নৈতিক রূপ লাভ করে। মানুষ ও জীবের দুঃখে সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের দুঃখ পরিত্রাণ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ধর্মতত্ত্বের একটি বিশেষ মহত্ত্ব তৈরি হয়। এই সাধনায় চিত্ত সংযমের মাধ্যমে সাধনার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ার কথা আসে। সিঁড়ির ঠিক উপরের প্রান্তেই আছে 'মহাসুখের' অবস্থান। যে সিঁড়ি বা উর্ধ্বগামী পথ পাড়ি দিয়ে একজন সাধক এই মহাসুখে পৌঁছাবেন সেটি একটি নাড়ি। প্রাচীন তন্ত্রে এটি একটি কল্পিত শরীরতত্ত্ব, যেখানে মেরুদণ্ডের ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত একটি নাড়ী কল্পনা করা হয়েছে, তন্ত্রে যার নাম সুষুম্না, আর এখানে 'অবধূতিকা'। এই বিশেষ সাধনা নারী-পুরুষের যুগল সাধনা। সহজতন্ত্রেরই সাধনা। সহজসাধনা হল বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই সকল আকর্ষণে সম্মোহিত না থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা।

এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত '*হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*' বইটিতে এভাবে মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

> "গ্রাহ্য আর গ্রাহকের পৃথক নাড়ি সাধারণ মানুষকে জগদ্বদ্ধ বিষয়বদ্ধ ও জীবনবদ্ধ করে রাখে, সাধকের তা হলে চলবে না। তিনি গ্রাহ্য-গ্রাহক দুই ধারাকে আকর্ষণশূন্য, বাসনাশূন্য, ফলে বেদনাশূন্য করে মিলিয়ে দেবেন- দুইকে মিলিয়ে পাবেন অদ্বয়, এবং সেই অদ্বয় ধারাকে এবার অবধূতিকার নালিপথ দিয়ে কয়েকটি ধাপে উপরে তুলে নেবেন। গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি মণিমূল চক্র থেকে তার নির্মাণচক্র, তার মূলাধার চক্র, এইভাবে উষ্ণীষকমলে সহস্রারে পৌঁছে মহাসুখ বা সহজানন্দের সন্ধান পাওয়া যাবে।"[১৮]

বজ্রযানের পরিবর্তিত একটি রূপ হল সহজযান। সহজযানীদের মতে করুণা পুরুষ এবং শূন্য প্রকৃতি। সহজযানী সাধকগণ সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে দেহ সাধনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম এক অস্বাভাবিক ব্যাপার যার কারণে মানসিক বিকৃতি ঘটে।

সহজ স্বাভাবিক দেহকামনার পরিতৃপ্তি লাভ করেই প্রকৃত আনন্দ। সহজানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করার মাধ্যমে মহাসুখে মগ্ন হয় বলেই এই শ্রেণীর সাধকগণকে সহজিয়া বলা হয়। তাঁদের সাধনার পথ সহজ পথ।

সহজিয়াদের ধারণা তাঁদের অনুসৃত পথ হল সহজ পথ। দেহবাদ বা দেহ সাধনাই (কায়া সাধন) সহজ সাধনার প্রধান লক্ষ্য। সহজ সাধকদের মতে দেহই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ। তাই তাঁদের বিশ্বাস দেহ সাধনার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। তাঁদের সাধনার মূল বিষয় হল দেহ মধ্যস্ত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের নির্বাণই প্রকৃত নির্বাণ।[১৯]

চর্যাগীতিতে সহজযানের ধারণা প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন যার মাধ্যমে বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন:

> "আমরা বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদে 'সহজ' সাধনার কথা শুনে থাকি। কেউ কেউ 'সহজ' সাধনাকে ভিত্তি করে 'সহজযান' কথাটি প্রয়োগ করেন। যেমন 'মহাযান' এবং 'হীনযান' তেমনি 'সহজযান'। কিন্তু 'সহজ' সাধনা হচ্ছে 'মহাযান' বৌদ্ধ মতবাদেরই একটি অংশ যাকে আমরা বজ্রযান বলে পূর্বে চিহ্নিত করেছি। বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সঙ্গে বৌদ্ধ 'সহজ' মতবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। 'হেবজ্রতন্ত্র' নামক তান্ত্রিক গ্রন্থে সহজ সাধনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে। তিব্বতী অনুবাদের উপর ভিত্তি করে সহজ শব্দের অর্থ করা যায় সহ-র সঙ্গে যার জন্ম অথবা 'সহ' নিয়ে যার জন্ম। তিব্বতী শব্দটি হচ্ছে 'lhan-cig skyes-pa'। ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ করেছেন 'l'Inne'বলে , Snellgrove- এর অনুবাদ হচ্ছে'the Innate'। এর অর্থ হল সহজাত বা অন্তর্জাত। বলা যেতে পারে এটা একটা শূন্য অবস্থা, সকল প্রকার দ্বৈততা অস্বীকার করে শূন্যরূপ অস্তিত্বে প্রবেশ করার একটি পদ্ধতি। অস্তিত্ব দুটি- সংসারি এবং নির্বাণ। কেউ কেউ বলেন সংসার এবং নির্বাণের সংবদ্ধ প্রকাশ নিয়েই অস্তিত্ব। সহজকে অনুভব করা সকলের জন্য সম্ভবপর নয়, যারা দীক্ষিত এবং শিক্ষিত হয়ে যথার্থরূপে সাধনার সর্বপ্রকার প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করতে সক্ষম এ-গানগুলো তাঁদের জন্যই অথবা বলা যায় গানগুলোই দীক্ষার সোপান। গানগুলোর সাহায্যে অস্তিত্বের একটি পবীত্র এবং পরিত্রাণী সত্ত্বা জাগ্রত হয়। চর্যাগীতিকায় মোট তেরটি ক্ষেত্রে সহজ কথাটি এসেছে। সম্ভবতঃ জটিল বলেই এর ব্যাপক উপস্থিতি নেই। জটিলতা বটেই কেননা সংসার এবং নির্বাণের সহ-অবস্থান একই মুহূর্তে উভয় সত্ত্বার সমস্বর বা সমকালীন বোধ একটি প্রহেলিকার ইঙ্গিত দেয়। যেভাবেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হোক না কেন, জটিলতার উন্মোচন ঘটেনা, ইংরেজীতে যাকে বলে ambiguity অর্থাৎ যা সরল নয় সেই অসরল তাই এই গীতিকাগুলির রহস্য। আমার কাছে সমস্ত বিষয়টি জটিলতার প্রধাবন এবং প্রসারণ বলে মনে হয়েছে। বোধিচিত্ত শব্দটির কোনও ব্যাখ্যাই সাধারণ পাঠকের গ্রহণ-যোগ্যতায় আনা যায় না, রহস্যের কথা আরও রহস্যময় করে বলা যায় মাত্র, কিন্তু রহস্যকে সহজ বিবেচনায় আনা যায় না।"[২০]

বজ্রযান ও সহজযানের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। তিব্বতী অনুবাদে সহজযানের বেশিরভাগ প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। কয়েকটি মূল গ্রন্থ নেপাল থেকে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশিত প্রাচীন বৌদ্ধ গান চর্যাপদ নামে পরিচিত তা মূলত বৌদ্ধ সহজপন্থী বা বৌদ্ধ সহজিয়াদেরই গান। সকল গানের রচয়িতা যেমন লুই, কাহ্ন, সরহ, ভুসুকু প্রমুখ আচার্যগণ তিব্বতী সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত হন। তাই ধারণা করা হয় এই সকল সিদ্ধাচার্যগণই সহজযান গড়ে তোলেন। চর্যাপদে সাধন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় সেটি সহজযানেরই সাধন পদ্ধতি। উদ্ধৃত কিছু পদে এই সহজ সাধনার অন্তর্নিহিত ভাব ফুটে ওঠে;

১. কাহ্ন বিলসঅ আসাবমাত ।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥
(৯ নং চর্যা, রাগঃ পটমঞ্জরী)

অর্থাৎ কাহ্ন সহজরূপে নলিনীবনে প্রবেশ করে মত্ত হয়ে মধুপান করে বিলাস করেন।

২. ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলে।

সহজানন্দ মহাসুখ লীলেঁ ॥

(২৭ নং চর্যা, রাগঃ কামোদ)

অর্থাৎ ভুসুকু বলেন, আমি মিলনে সহজানন্দরূপ লীলা দ্বারা মহাসুখ লীলা বুঝতে পেরেছি।

৩. অদভুঅ ভবমোহ রে দিসই পর অপ্পণা ।

এ জগ জলবিম্বাকারে সহজে সুণ অপণা ॥

(৩৯ নং চর্যা, রাগঃ মালশী)

এই ভবের মোহ অদ্ভুত। আপন ও পর দেখা যায়। এই জগত জলবিম্বাকার, সহজের দ্বারা আত্ম শূন্য বোঝা যায়।

৪. চীঅ সহজে শূন সংপুন্না ।

কান্ধবিয়োএঁ মা হোহিবিসন্না ॥

(৪২ নং চর্যা, রাগঃ কামোদ)

চিত্ত সহজের দ্বারা শূন্য ও পরিপূর্ণ হয়েছে। সন্ধ-বিনিয়োগে বিনষ্ট হয়েছে তাই বলে বিষণ্ন হোয়োনা।

৫. সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ।

(৪৩ নং চর্যা, রাগঃ বঙ্গাল)

এ ত্রিলোকে সহজরূপ মহাতরু স্ফুরিত হয়েছে।

উদ্ধৃতিগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ‘সহজ’ এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন সাধকের পার্থিব জ্ঞান বিনষ্ট হয়, কোনো আত্মপর ভেদাভেদ থাকে না। সংস্কার বিনষ্ট হয়ে ভাব ও মোহের বিলুপ্তি ঘটে শূন্যতা জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। সেই অবস্থাই হল সহজ সুখ। সহজ সুখ লাভ করতে পারলেই মুক্তি মিলবে।[২১]

সহজ সাধনা দেব-দেবী, পূজা পদ্ধতি, মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি সব ধরণের আনুষ্ঠানিক আচার বিরোধী। নেপাল ও তিব্বত অঞ্চলে সহজযান বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে। সহজযানী সিদ্ধা কর্তৃক রচিত গানই হল বৌদ্ধ সহজিয়া গান। যেখানে বামাচার এবং প্রকৃতিবর্জিত সাধনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সহজ সাধনায়ও প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের মধ্যমেই মহাসুখরূপ সহজের সৃষ্টি। সেটিই মূলত বোধিচিত্ত। সহজ সাধকগণ সাধনায় কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমনঃ মিথুনাত্মক তান্ত্রিকপদ্ধতি, প্রকৃতিবর্জিত বিশুদ্ধ যোগ-প্রণালী, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হঠযোগের (চন্দ্র+সূর্য) মাধ্যমে দেহ বা কায়া সাধনা।[২২]

তিব্বত ও নেপালে যে সকল বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুঁথি সংরক্ষিত ছিল সেগুলোর প্রতি বিদেশি গবেষকগণের দৃষ্টি প্রথমে পড়ে। Brain Hodgson নামক একজন ইংরেজ গবেষক সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক অনেকগুলো পুঁথি আবিষ্কার করেন। গবেষক Eugene Burnoufতাঁর *'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা'* (১৮৪৪) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি বড় ধরণের কাজ করেন। Daniel Wright এবং Cecil Bendall উভয়ই এই বিষয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঊনিশ শতকের শেষে এসে বাঙালী গবেষকগণ পুঁথি সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং ১৮৮২ সালে *'Sanskrit Buddhist literature in Nepal'* নামক একটি পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সংগ্রহের সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রাহক হিসেবে তিনবার নেপালে যান। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে Bendall *'সুভাষিতসংগ্রহ'* নামে একটি পুঁথি সংগ্রহ করেন যা বাংলা অক্ষরে লেখা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই পুঁথি দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন নেপাল থেকে আরও এমন কিছু পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভব যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অবদান রাখবে।১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বারের নেপালে যান এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত আরও কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন;

> "একখানির নাম চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থাকারের নাম সরোরুব্রজ টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নামও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।"[২৩]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদই মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন প্রণালী বিষয়ক গান। বৌদ্ধ সহজিয়া গান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। এখানে ধর্মসাধকদের ধর্মসাধনার রীতিনীতি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবার থেকে যে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেন। সংগ্রহের দশ বছর পরে তিনি নিজ সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে *'বৌদ্ধগান ও দোহা'* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেখানে ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। যা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে আচরণীয় ও অনাচরণীয় কর্মকাণ্ডের নির্দেশাবলী। ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ সংক্রান্ত পুঁথিটির নাম দেয়া হয় চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।[২৪]

এ প্রসঙ্গে মনীন্দ্র মোহন বসু যথার্থই লিখছেন: "পুথিতে যে পাঠ রহিয়াছে তাতে যখন অর্থ-সঙ্গতি লক্ষিত হয় তখন কল্পনার সাহায্যে নামের পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি অর্থ সঙ্গতি দেখিয়েছেন এভাবে- চর্য্য অর্থে আচরণীয় এবং অচর্য্য অর্থে অনাচারণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মসম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল।"[২৫]

পরবর্তীকালে নেপালে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সংস্কৃত টীকাও পাওয়া যায় এবং তার কিছুদিন পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদগুলোর একটি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের যে পুথি সংগ্রহ করেন, সেখানে পদসংখ্যা ছিচল্লিশটি একটি পদ খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে হয় সাড়ে ছিচল্লিশটি টি। শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন সেখানে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা মোট একান্নটি।[২৬] বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিভেদ রয়েছে। ড. শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা এই গানগুলোর রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এর মতে সিদ্ধাচার্য লুইপা এবং

সরহপা এই দুজনই রাজা ধর্মপালের (৭৬৯-৮০৯) সমসাময়িক ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই গানে আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভাষার বিবেচনায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ধারণা করেন এখানে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি রূপ রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সিদ্ধাচার্যগণের জীবনকালের উপর ভিত্তি করে যে সীমা অনুমান করেছেন সেখানেও সহজিয়া গানের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই থাকে।[২৭]

শবর পা- ৬৮০-৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ

লুই পা- ৭৩০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ

বিরূ পা- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কাহ্ন পা- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

ডোম্বী পা- ৭৯০-৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ

ভুসুকু পা- খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

কুক্কুরী পা- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কম্বলাম্বর- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

আর্যদেব- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী (কম্বলাম্বরের সমকালীন)

কঙ্কণ- খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী (কম্বলাম্বরের বংশজাত অথবা শীষ্য)

মহীধর- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী (কাহ্ন পার শীষ্য)

ধর্ম্মপাদ- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী (কাহ্ন পার শীষ্য)

ভাদ্রপাদ- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী (কাহ্ন পার শীষ্য)

শান্তিপাদ- খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ

বীণাপাদ- খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী

দারিকপাদ- খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)

সরহ পা- খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ও কায়া সাধনায় বিশ্বাসী। প্রেবোধচন্দ্র বাগচি নেপাল থেকে বৌদ্ধ সহজিয়া গানের যে তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন তার মূল সংকলনে গানের সংখ্যা ছিল আনুমানিক একশ। পরবর্তীকালে শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরও দুইশ পঞ্চাশটি গানের সন্ধান পান। সেখান থেকে তিনি একশটি গান নিয়ে নতুন করে একটি নির্বাচন সংকলন তৈরি করেন। উদ্ভবের প্রথমদিকে গানের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কাল পরিক্রমায় অল্প সংখ্যকই সংরক্ষিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রবোধ চন্দ্র বাগচি কর্তৃক সংগৃহীত গিতাবলীই সর্বজন গ্রাহ্য। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সহজযানী মতের প্রকাশ ঘটেছে। এই গীতরীতিতে ধর্ম তত্ত্বের চেয়ে সাধন তত্ত্বের উপর বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[২৮]

এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর '*হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা*'-র মুখবন্ধে বলেছেন- "এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমারা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি সাহিত্যের কথাই কহিব।"[২৯]

সহজিয়া সাধকদের সাধন চিন্তা ছিল তন্ত্র প্রভাবিত। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের থেকে সত্যলাভের উপযোগী সাধনপন্থার উপর বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তন্ত্রেও মূল সাধনাই মূলত কায়া সাধনা। দেহের মধ্যেই পরমসত্য বিরাজমান। তাই দেহকে অবলম্বন করে সাধনা করলেই সত্যের উপলব্ধি ঘটে। সহজিয়া সাধকগণ দেহের আশ্রয়ে তাঁদের ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ধারণা বোধিচিত্ত লাভ অথবা মহাসুখই হচ্ছে পরমসত্য যা একজন সাধকের পরম কাম্য। সাধনার মাধ্যমে প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা ও উপায় রূপিণী করুণাকে মিলিত করতে সক্ষম হলেই মহাসুখ লাভ করা যায়।[৩০]

বৌদ্ধ সহজিয়া গান বাংলা সংগীতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতধারা বাউল গান এই বৌদ্ধ সহজিয়াগানের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাথে বাউল গানের সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে উভয় গীতধারায় যে সাধনা ও দর্শনতত্ত্ব সেখানে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় থেকে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময়ে আরও কিছু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সহজিয়া, কৌলমার্গ, অবধূত-মার্গ, আউল। প্রতিটি মত বা সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সংঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সকল সম্প্রদায়ের সাধন তত্ত্বে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির পর সুফি প্রভাবিত বৈষ্ণব মতের অপর একটি সহজিয়া ধারার প্রবর্তন ঘটে। সেন আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপরে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব পড়ে। নাথ সম্প্রদায়ের সাধকগণ প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে শিব-উমা নামের মাধ্যমে তাঁদের তাঁদের সংস্কার ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সংমিশ্রণে নাথসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি এই নাথ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নাথদের পীঠস্থান কামাখ্যা। মীননাথ ও গোরক্ষনাথের নামানুসারেই এই সম্প্রদায় নাথ সম্প্রদায় বা নাথ ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। নাথ সম্প্রদায় শূন্যবাদ এবং কায়া সাধনায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ও কায়া সাধনায় বিশ্বাসী। এখানে শূন্যবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে নাথ সম্প্রদায়ও তারা যোগী, গোরক্ষনাথী, কানফাটা, দর্শনী, সিদ্ধ প্রভৃতি উপমতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্গাপূজা, যোনী ও লিঙ্গপূজা, চক্রপূজা, শ্রীযন্ত্রপূজা প্রভৃতি পূজা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। নাথপন্থীগণ শক্তিকে 'মাতৃকা' জ্ঞান করে না। নাথপন্থের লক্ষ্য ছিল মারণ-বশীকরণ-উচাটন-জ্যোতিষী প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচার সিদ্ধি।[৩১]

বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির পর সুফি প্রভাবিত বৈষ্ণব মতের অপর একটি সহজিয়া ধারার প্রবর্তন ঘটে। বৌদ্ধ সহজিয়ার সাথে বৈষ্ণব সহজিয়ার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে প্রজ্ঞা-উপয়ায়ের স্থানে রাধা-কৃষ্ণ নামের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, নামাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় এবং রসাশ্রয় ভজনপ্রণালির অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রেমাশ্রয় এবং রসাশ্রয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই রস নর-নারীর সম্ভোগ স্বরূপ। এই রস আবার দুই ধরণের। যথা: স্বকীয় এবং পরকীয়। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় পরকীয়া রসই প্রধান।

ব্রজলীলাতে পরকীয়া প্রেমের তীব্রতা গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্যের পরিচয় ফুটে ওঠে:

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

ব্রজবধূগণের এনভাব নিরবধি।

তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥[৩২]

(চৈতন্য চরিতামৃত-আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণ তাঁদের সাধনার নাম দিয়েছেন 'রাগের ভজন'। এই 'রাগের ভজন' শাস্ত্রগত বিষয় নয়, এটি প্রেম মার্গীয় ভজন। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে পুরুষও প্রকৃতিকে রাধা-কৃষ্ণ রূপে গ্রহণ করেন। প্রেম সাধনায় তাঁদের এই রাগের ভজন এবং প্রেমের মিলনই যুগল-ভজন বা যুগল-মিলন হিসেবে পরিচিত। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগনের মতে এই যুগল-ভজন শাস্ত্র বহির্ভূত।

"রাগের ভজন   যাজন কঠিন

আচার বিষম হয়।

বেদ বিধি ছাড়েকুল পরিহারে

তবে হয় প্রেমোদয় ॥"[৩৩]

সহজমতে প্রত্যেক নারীই রাধিকা এবং প্রত্যেক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণব মতে অনন্তকাল ধরে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রবাহমান। আবার এক শ্রেণীর সহজিয়াদের ধারণা দেহের ভিতরেই পরমতত্ত্বের অবস্থান। তাঁরা নিষ্কাম প্রেমে বিশ্বাসী। দেহসাধনাকে নিষ্কাম প্রেম সাধনায় পরিণত করাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় পদ রচনা করেছেন:

তোরা না হইবি সতী   না হইবি অসতী

থাকিবি লোকের মাঝে ॥[৩৪]

মূলত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় প্রেমকেই ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সহজ সাধনায় নারী নিয়ে সাধনা করা উত্তম বলে মনে করা হয়। এই সাধনায় নারী গ্রহণের যে নিয়ম রয়েছে তাকে 'রাধাভজন' বল যায়। এর অপর নাম 'আরোপসাধনা'। এখানে পরকীয়া প্রেমই প্রধান।[৩৫]

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় চণ্ডীদাসকে যথার্থ সহজিয়া সাধক হিসেবে স্বীকার করা হয়। এই মতে ধারণা করা হয় যে, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বাসুদেব কন্যার সাথে সহজ সাধনায় সিদ্ধ হন। আদি বৈষ্ণব ধর্মের পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব বৈষ্ণব সহজিয়া মতে কার্যকরী ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া মত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম, তন্ত্র ও যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যোগ ও তন্ত্র মতে দেহের মাঝেই ব্রহ্মাণ্ড নিহিত। বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় এ মতটিকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করেছেন।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এই মতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই ৷৷

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের গুরুবাদ, গুহ্যসাধন, প্রহেলিকা ও উল্টোরীতির সাধনার ধারা রয়েছে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় ও সেই সকল গুহ্য সাধনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। একই ঐতিহ্য ধারণ করে সৃষ্ট সকল সহজিয়া মতে স্বীয় সাধন পদ্ধতি ও উপমার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া-পদাবলি ও সহজিয়া সাধনার অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের রচয়িতা হিসেবে চণ্ডীদাস, বিদ্যপতি, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি, নরোত্তম, চৈতন্যদাস, লোচন প্রমুখ সমাদৃত। শিবশক্তির কথোপকথনের মাধ্যমে বৈষ্ণব সহজিয়ামতের নিগুঢ় সাধনতত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন কাহিনি, কথকতা ও পালা-পার্বণে শিবের সহজ সাধনার কথা উদ্ধৃত হয়েছে।[৩৬]

বৌদ্ধধর্মের গুহ্য সাধনা এবং তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্মের সংমিশ্রণে নতুন একটি রূপ কৌলমার্গের সৃষ্টি। কৌলধর্মের অনুসারীগণ মনে করেন, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা থেকে তাঁদের ধর্মের সুত্রগুলো প্রাপ্ত অনেকেই মনে করেন সিদ্ধাচার্য লুইপা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। তাই ধারণা করা হয়, কৌলধর্ম নব বৌদ্ধ গুহ্য সাধনা থেকেই উদ্ভূত। বৌদ্ধ সাধনপন্থায় আমরা কুলের উপস্থিতি আগেই লক্ষ্য করেছি। বৌদ্ধ ধর্মীয় সাধনায় পঞ্চকুল একটি বিশেষ অঙ্গ। পঞ্চকুল প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটি রূপ আছে যাদের প্রধান পঞ্চতথাগত। যাঁরা এই কুলতত্ত্ব বিশ্বাস করেন এবং মেনে চলেন তাঁরাই কুলপুত্র। কৌলমার্গীয় মতে কুল হচ্ছে শক্তি, এর বিপরীতে আছে অকুল যিনি শিব এবং দেহের ভিতরে কুণ্ডলাকারে সুপ্ত অবস্থায় যিনি আছেন তিনি কুলকুণ্ডলিনী। কুলকুণ্ডলিণীকে জাগ্রত করে শিবের সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলিত করাই কৌলমার্গীয় সাধনা।[৩৭]

অবধূত-মার্গ সাধনাও সিদ্ধাচার্যগণের গুহ্যসাধনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সিদ্ধাচার্যগণের যোগসাধনায় যে তিনটি প্রধান, তাদের মধ্যে প্রধানতম অবধূতিকা। এই যোগ-সাধনা অবধূতি নাড়ীর গতি ও প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করত বলে ধারণা করা হয়। এই মতের সাধকগণ কঠোর সন্ন্যাস জীবন পালন করতেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মতাদর্শের সাথে অবধূত-মার্গের সাদৃশ্য রয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুগণ যে সকল ধূতাঙ্গ আচরণ করতেন অবধূত-মার্গের সাধকগণ ও তাই করতেন। এই ধূত বা ধূতাঙ্গ আচরণের জন্য তাঁদেরকে অবধূত বলা হয়। সাধকগণ লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে বনে জঙ্গলে গাছের নিচে বাস করতেন। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনধারণ করতেন এবং জীর্ণ কাপড় পরিধান করতেন। অবধূত-মার্গের অনুসারীগণ বর্ণাশ্রম, শাস্ত্র, তীর্থ কিছুই মানতেন না। পার্থিব জীবনে তাঁদের কোন আসক্তি ছিল না। তাঁদের জীবনাচরণ ছিল উন্মাদের মত। সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রের অপর একটি নাম অবধূতি-পাদ। তিনি অবধূত-মার্গী ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে অবধূত মতাবলম্বীদের জীবনাচরণের বর্ণনা রয়েছে। চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দও অবধূত-মার্গী ছিলেন।[৩৮]

বৌদ্ধ সহজিয়া মত থেকে বাউলমত পর্যন্ত এই পথ পরিক্রমায় আর একটি বিশেষ মতের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সেটি হল সূফীমত। এটি ইসলামিক ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'সূফী' শব্দটির উদ্ভব নিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। ধারণা করা হয় সূফীশব্দটি আরবী 'সূফ' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'উল' বা 'পশম'। প্রাথমিক যুগে ধর্মতাত্ত্বিকগণ পশমি বস্ত্র পরিধান করে সাধনা করতেন বলে তাঁদেরকে সূফী বলা হয়। এটি একটি প্রাথমিক ধারণা। কেউ কেউ আবার 'সাফা' (পবিত্রতা) শব্দ থেকে সূফী শব্দের

উৎপত্তি বলে ধারণা করেন। আবার একজন গবেষক বলেছেন সূফীপন্থ একটি ভিন্নতর ধর্ম, তবে ইসলাম বহির্ভূত নয় এবং একে 'Islamic Mysticism'বা ইসলামীয় মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলে। ইরানে সূফী ভাবধারার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে। মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতবর্ষে সূফী মতের আগমন ঘটে। প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অর্থাৎ ঐশ্বরিক ঐক্য লাভ করাই এই মতের অভীষ্ট লক্ষ্য। সূফীবাদ আধ্যাত্ম সাধনায় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথ পরিক্রমায় কিছু স্তরবা পর্যায় আছে, এই স্তরগুলোকে মকাম বলা হয়। এই মকামগুলো সফলভাবে পার হতে পারলেই বিশেষ অবস্থায় পৌঁছানো যায়। সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য মারিফত বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে খাঁটি সত্যে বিলীন হওয়া এবং অপর একটি স্তর বাকায় পৌঁছানো অর্থাৎ রিপু দমন করে মহা সত্য লাভ করার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়া।[৩৯]

সূফীবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরের মাঝে লীন হয়ে যাওয়া। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা ঘটান। ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভের জন্য শাস্ত্রমতে সাধন পথে চারটি মকামের কথা বলা হয়েছে। মকাম চারটি শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফাত নামে পরিচিত। কবি পাঞ্জু শাহ বলেন:

আল্লাহতাআলা চার রাহা করিয়াছে তায়।

শরিয়ত তরিকত জানিবা ত্বরায় ॥

হকিকত মাফরুত এই চারি হয়।

চারি রাহে দুই ভেদ জানিবা নিশ্চয় ॥

এই চারটি মকাম একে অপরের পরিপূরক। প্রতিটিরই অবস্থনের ব্যাখ্যা রয়েছে। শরিয়ত হল সোজা বা সরল পথ। সরল বা সঠিক পথে ইসলামের বিধি মেনে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওার উপয়াই হচ্ছে শরিয়ত। শরিয়তের বিধিনিষেধ সঠিকভাবে অনুসরন করতে পারলে সাধক পরের মকাম তরিকতে পৌঁছান। এই পথের জন্য একজন পথ-প্রদর্শক প্রয়োজন যাঁকে বলা হয় পীর। তিনিই সাধককে পথ দেখান। তরিকার আবার উপবিভাগ রয়েছে। কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, চিশতিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া প্রধান। তরিকতের পরে হকিকতের স্থান। কোরআনের মূল অর্থ অনুসন্ধানই হকিকত। মারিফত ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের সর্বশেষ ধাপ এটি। এখানে পরিশুদ্ধ মনের সঙ্গে স্বর্গীয় জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটান হয়। ঈশ্বরের আরাধনা করলে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয় তখন ব্যক্তি ইচ্ছা বিলুপ্ত হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপে প্রকাশ ঘটে। সূফীধর্ম সন্ন্যাস বা গৃহধর্ম নয়। স্রষ্টার প্রতি প্রেম এই সাধনার প্রধান অবলম্বন। এখানে নাথ সহজিয়া সিদ্ধাদের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কায়া সাধনার যে পদ্ধতি সূফী সাধনায় দেখা যায় তার সাথে সিদ্ধাচার্যগণের সাধনার সাদৃশ্য রয়েছে। কায়াসাধনা একটি কঠিন শরীরবৃত্তীয় সাধনা। এখানে মানুষই সত্য মানুষই মহান। সূফী সাধনায় মানব সেবাকে স্রষ্টার প্রতি প্রেম বা গভীর নিষ্ঠা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জিকির হল সূফী সাধকদের আনুষ্ঠানিকতা যা ভারতীয় যোগ-পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪০]

বাউল একটি বিশেষ মতবাদ, সাধনপদ্ধতি, একটি ধর্ম। এই সম্প্রদায়ের গানই বাউল গান হিসেবে পরিচিত। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে বাউল গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। বাউল গানের উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ গানের মধ্য দিয়ে অনুসারীদের নিকট সাধনার কথা প্রকাশ করতেন যা বৌদ্ধ সহজিয়াগান বা চর্যাগীতি হিসেবে

পরিচিত। এই বৌদ্ধ সহজিয়া গানেই বাউল গান ও বাউল সাধনার বীজ নিহিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজ সাধনায় বাউল তত্ত্বের আদি রূপের সন্ধান মেলে। বৌদ্ধ, ইসলাম ও হিন্দু এই তিন শ্রেণীর সহজমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে বাউল গানে। তবে শেকড় হিসেবে বৌদ্ধ সহজিয়া গানের নামই পাওয়ায় যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং ইসলামি সুফিবাদের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে বাউল মত। যেখানে যোগ ও তন্ত্র, মৈথুন ও সহজ সাধনার ধারা এসে মিলিত হয়েছে। ধারণা করা হয় বাউল গানের উদ্ভব মধ্যযুগে। তবে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন: "আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বাউলধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।" আহমদ শরীফও অভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে: "বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কি ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকির হইতে।"[৪১]

বাউল সম্প্রদায় একটি মরমি সাধক সম্প্রদায়। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। কেউ বলেছেন 'বাতুল' শব্দটি থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। আবার কারো ধারণা 'বায়ু' শব্দটির সাথে 'ল' প্রত্যয়যোগে বাউল শব্দটি এসেছে। আবার কেউ কেউ এমন ধারণাও পোষণ করেছেন যে চর্যাপদের ব্রজকুল থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বাউল শব্দটি গঠিত হয়েছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন বাংলা কাব্যে বাউল শব্দের প্রয়োগ ছিল বলে প্রমান মেলে। মলাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে প্রথম বাউল শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়।

মুকুল (ত) মাথার চুল   নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে ॥[৪২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে ধাঁধার ছলে বাউল সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল
বাউলকেকহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহি ক আউল
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল ॥[৪৩]

চণ্ডীদাসের একটি পদে বাউল শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুন মাতা ধর্মমতি   বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী?[৪৪]

বাউল সম্পপ্রদায়ভুক্ত যারা তারা বেশির ভাগই মূলত সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষ। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নিষ্ঠুর প্রথা যেমন: জাতিভেদ, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, শোষণ, শাসন ও অবিচারের শিকার ছিল তারা। সমাজের অধিকার বঞ্চিত নিপীড়িত সেই মানুষগুলো তখন আধ্যাত্মবাদ মরমিবাদের উপর ভিত্তি করে একটি

শাস্ত্রাচারবিহীন উদারনৈতিক এবং অসাম্প্রদায়িক একটি নতুন লৌকিক ধর্মের অনুসন্ধান করেন, যেটি কালের বিবর্তনে বাউল সম্প্রদায় বা বাউল ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৪৫]

পণ্ডিত অরবিন্দ পোদ্দার বাউল মতের উদ্ভবের নেপথ্যে একটি প্রেক্ষাপট দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে;

> "সমাজের দাবী তাঁরা [বাউলেরা] সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।... এই প্রত্যাখানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ-বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান অথবা বর্তমান ছিল, তা বলাই বাহুল্য। যাঁরা উত্তর সাধনারূপে এই ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং সামাজিক কর্ম-সম্পর্কেও বাইরে আপনার ঠাই খুঁজে নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে না হলেও যাঁরা প্রথম প্রবক্তা, তাঁরা প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া এ পথের পথিক হয়েছেন, এটা ভাবা কঠিন।"[৪৬]

ড. আহমদ শরীফ উত্তর ভারতের 'বাউরা' শব্দের সাথে 'বাউল' শব্দের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আরও ধারণা করেন, 'আকুল' শব্দ থেকে 'আউল' এবং 'ব্যাকুর' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন 'বাউল' শব্দটি 'আউল' শব্দ জাত। আউল শব্দটি আরবী 'আউলিয়া' (অলির বহুবচন) থেকে উদ্ভূত। আবার কারো মতে 'আউল' শব্দ 'আওয়াল' শব্দ থেকে আগত। আগমের আরবী পরিভাষা হিসেবে 'আউয়াল' শব্দটি নিয়ে মুসলমান আগম তাত্ত্বিকগণ 'আউয়াল' বা 'আউল' নামে পরিচিতি পান। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ বলেন:

> "...ব্যাকুল' বা 'বাতুর' থেকেই 'বাউল' নামের উদ্ভব বলে ধারণা করা সম্ভবপর। আমাদের অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উঁচুস্তরে বাউলেরা কোন কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পায়নি। তাই মনে হয়, 'ব্যাকুল' (ভাবোন্মত্ত) কিংবা 'বাতুল' (অপদার্থ) অর্থে উপহাসস্থলে তাঁদের এই নামকরণ হয়েছে। আর 'আউয়াল' থেকে 'আউল' শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না।"[৪৭]

শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় বাউলদের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রাচীন প্যালেস্টাইনে প্রচলিত 'বা'আল' নামক মরমিয়া সাধকদের সাথে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এই সাধকগণ প্রচলিত বিধি মোতাবেক ধর্মকে অনুসরন করেননি। তাঁরা দেহবাদী সাধনায় নিয়োজিত ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন প্যালেস্টাইন থেকে এই মত আরব ও তার পাশের দেশে বিস্তার লাভ করে। এই সম্প্রদায় অনুসরনের জন্য জনগণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এদের ক্রিয়া প্রজনন কেন্দ্রিক এবং মৈথুনাত্মকতাই ধারণা করা হয় এই সম্প্রদায় থেকেই বাউল মতের উৎপত্তি।

গবেষক এস এম লুৎফর রহমান বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে বাউল শব্দের উৎপত্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি ধারণা করেন চর্যাপদের মধ্যেই বাউল শব্দের আদিরূপ নিহিত। এখানে ব্যবহৃত বাজিল>বাজুল> বাজির> বাজ্জিল শব্দগুলো বাউল শব্দেরই পূর্বের রূপ। তিনি এই মতবাদ ব্যক্ত করেন বাউল বৌদ্ধ বজ্রযানী সাধনা ও সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে। বাউল মতের বিকাশ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে চৈতন্যদেব মুসলমান সমাজে আউলচাঁদ রূপে আবির্ভূতহন এবং পরবর্তীতে জনসাধারণের মাঝে প্রসার ঘটান। আবার ধারণা করা হয় নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র বাউল মত প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকাপালন করেন। বীরভদ্রকে বাউল সাধনায় অনুপ্রাণিত করেন তাঁর দীক্ষাগুরু ও বিমাতা জাহ্নবী দেবী। মূলত বরেন্দ্র বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য থেকে যে সকল বাউলগণের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা বিশ্বাস করেন বীরভদ্রই বাউল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।[৪৮]

বাউল মতের আদিতে বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র ও সূফীতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রাচীন তন্ত্রসাধনা বাউল সাধনাকে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্রেও সাথে সমাজের নিচু শ্রেণীর কৃষিজীবী মানুষের গভীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে আদিমযুগ থেকেই। সম্ভবত আদিম কৃষিজীবী সমাজের ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করেই তন্ত্র বিস্তার লাভ করে।

শশিভূষণ দাশ গুপ্ত বলেন:

> “ Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin, it seems to be a religious undercurrent, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in religious history of India. With this practices and yogic processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological systems got closely associated in different times. তিনি আরও বলেন, Side by side with the commonly known theological speculations and religious practices, there has been flowing in India an important religiuos undercurrent of esoteric yogic practices from a pretty old time ; these esoteric practices, when associated with the theological speculations of the Saivas and Saktas have given rise to Saiva and Sakta Trantrism; and again , when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism, the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.”[৪৯]

অতএব,

> “The real of the cult lies more outside Buddhism than inside it.”[৫০]

তন্ত্র সাধনা বাউল মতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকাপালন করেছে। পরবর্তীতে সূফীতত্ত্বের প্রভাবও পড়ে। বাউল গানে ইসলাম প্রভাবিত সূফী মতের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর সাথে মিলনের একটি আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয় বাউল গানে।সূফীতত্ত্বের প্রভাবে বাউল গানে একধরণের দ্বন্দ্বের জন্ম হয়।

বাউল ও বাউল গানে সূফীতত্ত্বের প্রভাব প্রসঙ্গে অধ্যাপক লেভি বলেছেন:

> “In treating Sufism the authoritative manuals generally contain some discussion concerning the elements of the good life as convinced by various schools, but the fact that the basic princple of the system is the reality of God alone led, adopts to frame their own corollaries…since morality in learge measure, though not entirely concearns man as a social being, some of the more enligntened of the Sufis insisted that the true saint lives among his fellow-men mades with them, marriee and takes part in social activities without ever forgetting God for a moment. There were those, however, who regarded ascetic seclusion as the means of achiving goodness. Furthermore, in an early stage of the history of Sufism, Quranic teaching concerning predestination developed logically into towakkul ‘absolute reliance’ upon God, and therefore, into quietsm.”[৫১]

বাউল গানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্থান রয়েছে। বৌদ্ধ সহজ সাধনার প্রভাব যেমন রয়েছে। হিন্দু তন্ত্রেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবার ইসলাম প্রভাবিত সূফীতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সূফীতত্ত্ব বাউল মতবাদেও থেকে বাউলদের জীবনাচরণে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বাউল ধর্ম মূলত মানব ধর্ম। যোগ, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে এবং সুফীসাধনতত্ত্বে দেহকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাউল গানে দেহ সাধনার মূল বিষয়। দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বাউল গানের মূল ভাবনার বিষয়। বাউল সাধকগণ তাঁদের গানের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বাউল সাধক সিরাজ সাঁই বলেন:

ফকিরি করিবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে,
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে ॥
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভালো লাগে ॥
অটলপ্রাপ্তি কিসেতে হয়
গুরুর কাছে জানগে রে তাই,
টল কি অটল রতি সেই
নেহার করে জান আগে ॥
ভাবে ফকিরি সাধন করে
খোলসা রও হুজুরে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ে
আত্মতত্ত্ব জান রে আগে ॥[৫২]

বাউল মতবাদ সব ধরণের ভাবাবেগ ও কূপমণ্ডূকতা বিরোধী। বাউল সাধকগণ স্বচ্ছ মানবতাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী এবং বস্তুবাদী জীবনাদর্শের অধিকারী। কোনো ধরণের কুসংস্কার ও সম্পদায়গত দন্দ্ব বাউলকে স্পর্শ করতে পারে না। বাউল মত মূলত লোকজীবন ও লোকমানস থেকে উৎসারিত একটি ধারা। মানব সেবা অর্থাৎ 'মানুষ তত্ত্ব' বাউল সাধনার মূল লক্ষ ও উদ্দশ্য।শাস্ত্রাচার, জাতিগত বিভেদ, ঈশ্বর, ইহলোক, পরলোক, জন্মান্তর, সকল কিছু বাউলেরা অগ্রাহ্য করে। বাউল এই মাটির পৃথিবীতেই ব্রহ্মাণ্ডের সাধনা করে ("ভাণ্ডে করে ব্রহ্মণ্ডের সাধন")। বাউল সাধনায় নারীর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পূজনীয়। বাউল সাধনার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িকতা নারী-পুরুষ বিভাজন, হিংসা-দ্বেসমুক্ত একটি সমাজ বিনির্মাণের জন্য কাজ করা বাউলদের উদ্দেশ্য। বাংলা লোকসংগীতের অন্যতম ধারা হচ্ছে বাউলগান। এই গীতরীতি বিশেষ একটি মতপদ্ধতি ও জীবন দর্শনের প্রণালী। বাংলার মানুষের জনজীবনের ও জনমনের ক্রম পরিণতির সাথে বাউল সাধনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তার মধ্যে লোকসাহিত্য চর্চার অনুষঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাউল গানের চর্চা শুরু হয়েছিল এবং আজও তা ক্রমপর্যায়ে চলে আসছে।[৫৩]

তথ্য সূত্রঃ

১. উদ্ধৃত, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬-৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

৩. যতীন সরকার (সম্পাদিত), *বৌদ্ধ দর্শন রাহুল সাংকৃত্যায়ন*, রুকু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৬,পৃ.৬৯

৪. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৪-৫৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৬. এবাদত হসেন, *চর্যা-পরিচিতি*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭০, পৃ. ৭-৮

৭. উদ্ধৃত, আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২, ৩৭

৮. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০.আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৪

১১. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৮৯-৯০

১২. ডক্টর আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫১

১৩. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৮-৩৯

১৪. শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাকচি, *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৪৭-৪৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১৬. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. প্রাসঙ্গিক- ক

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. প্রাসঙ্গিক- খ

১৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলকাতা, ১৩২৩, পৃ. ভূমিকা- ১৪, ১৫

১৯. এবাদত হসেন, *চর্যা-পরিচিতি*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭০, পৃ. ৯

২০. সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. প্রাসঙ্গিক- ঘ

২১. শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচি, *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৫২-৫৩

২২. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯

২৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২-১৩

২৪. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৮৯-৯০

২৫. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, (৭ম সংস্করণ) ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩

২৬. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৮৯-৯০

২৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ,(৭ম সংস্করণ),

ঢাকা, ২০১৭পৃ. ৮

২৮. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

৩১. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ.৪০-৪১

৩২. মোহনকালী বিশ্বাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৭

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩৬. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৮-৫৯

৩৭. রায়হান রাইন (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৯

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯-১৪০

৩৯. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২২-১২৬

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩৩

৪১. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫, ১৬

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, ১৭

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪৬. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮২

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৪

৪৮. শামসুজ্জামানখান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৬

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৫৩. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের সাধনতত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের সাধনতত্ত্ব

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদ দোহা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা সহজিয়া মতবাদটি এখানে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রে সহজিয়া সাধকগণের সাধনার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। এখানে বিভিন্ন প্রকার পূজা-অর্চনা, ক্রিয়া-কলাপ, তন্ত্র-মন্ত্র ও যোগ-সাধনার সাথে সহজিয়া সাধনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত মহাযান বৌদ্ধধর্মের থেকেই সকল ধারার উদ্ভব হয়েছে। মহাযান ধর্মমত কালের বিবর্তনে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে সহজযানে এসে রূপ লাভ করে। চর্যাপদ তথা চর্যাগীতি গুলোর মাধ্যমে বৌদ্ধসহজিয়া সাধনতত্ত্বের ধারণা লাভ করা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে সহজযান সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়না। বজ্রযান-পন্থী একশ্রেনীর সাধকগনের কিছু মত ও সাধন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সহজযান কথাটির প্রয়োগ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[১]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'* বইটিতে সহজযান বা সহজ সাধনা সম্পর্কে বলেছেন:

> "এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলার দুইদিক থেকে সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ তাঁদের'সাধ্য'ও ছিল 'সহজ'- আবার 'সাধন'ও ছিল সহজ। প্রত্যেক জীবের- প্রত্যেক বস্তুর একটি 'সহজ'স্বরূপ আছে- এটাই সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করে মহাসুখে মগ্ন হতে হবে- এটাই হল এইপন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ- এ জন্যই তাঁরা সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করতেন না- গ্রহণ করতেন সরল সোজা পথ, এ জন্যও তাঁরা সহজিয়া।"[২]

সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলেছেন:

উজুরে উজুছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।

নিঅড়ি বোহি মা জাহুরেলাঙ্ক ॥[৩]

(৩২ নং চর্যা, রাগ-দেশাখ)

'অর্থাৎ, সহজপথেই বোধিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সহজিয়া সাধনার মাধমেই সাধক এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করতে হয় না। বোধি নিকটেই রয়েছেন। সহজ সাধনার পথ সোজা ও ঋজু পথ। সহজিয়া সাধনার পথই উত্তম।

সিদ্ধাচার্যগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল চর্যাপদগুলোর মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করা। সাধকগণ অনুধাবন করেছিলেন যে চর্যাগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি দুরূহ। তাঁরা পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবন থেকে উপমা ও রূপকের সাহায্য নিয়ে সকলের বোধগম্য করার চেষ্টা করেছিলেন। নির্বাণ, সহজানন্দ বা মহাসুখ বোঝা, অনুভব করা ও প্রকাশ করা কঠিন।সিদ্ধাচার্য লুইপার একটি পদে নির্বাণতত্ত্বের দুর্বোধ্যতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

যেমন:

জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী।

সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥

কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।

উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥

লুই ভণই ভাইব কীষ।

জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দীস ॥[৪]

(২৯ নং চর্যা, রাগঃ পটমঞ্জরী)

অর্থাৎ, যার বর্ণ-রূপ-চিহ্ন জানা নেই সেটি আগম বা বেদের মাধ্যমে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাকে কী বলে পরিচয় দেব! চাঁদ যে জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সেটি সত্যি নাকি মিথ্যা। লুইপা বলছেন আমি কী ভাববো ? যা নিয়ে আছি তার উদ্দেশ পাইনা।

সহজানন্দ সম্পর্কে এবাদত হসেন '*চর্যা পরিচিতি*' নামক গ্রন্থে বলেনঃ"কাহ্নপার একটি পদে সহজানন্দের অনির্বচনীয়তা ও অনধিগম্যতার কথা বলা হয়েছে। সে সহজানন্দ দেহমন বা বাক্যের দ্বারা অনুভব বা প্রকাশ করা যায় না।[৫]

ভন কইসেঁ সহজ বোলবা জায়।

কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায় ॥

আলেঁ গুরু উএসই সীস।

বাকপথাতীত কাহিব কীস ॥

জেতই বোলী তেতবি টাল।

গুরু বোব সে সীসা কাল ॥

ভণই কাহ্ন জিন-রঅণবি কইসা।

কালে বোব সংবহিঅ জইসা ॥[৬]

(৪০ নং চর্যা, রাগ- মালসী গুবড়া)

অর্থাৎ, কীভাবে সহজানন্দের কথা প্রকাশ করা যায়, কায়-বাক, চিত্ত যেখানে প্রবেশ করেনা। সহজানন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাক্যের মাধ্যমে বলতে গেলেই ভুল হবে। সহজানন্দকে বোঝানো যায় না। তাই গুরু বোবা। কারণ গুরুর কাছে ভাষা নেই এবং শীষ্য কালা কারণ ভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা না পেয়ে কিছুই তার বোধগম্য হয় না। তাই কাহ্নপা বলেন, কীভাবে জিনরত্নকে বোঝানো যাবে? উত্তর হল আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে হবে এবং এই আভাসে ইঙ্গিতেই সহজানন্দ বুঝতে হয়।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে ধর্মীয় সাধনপ্রণালীই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। কেননা সিদ্ধাচার্যগনের চিন্তা চেতনা তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা সত্য লাভের সাধনপদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব নয় মূল সাধনাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কায়াসাধনা হল বৌদ্ধতন্ত্রের মূল সাধনা। দেহকে অবলম্বন করে সাধনা করলেই পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সহজ সাধকগন দেহকে ভিত্তি করেই ধর্ম ও সাধনার তত্ত্বের প্রতিপাদন ঘটিয়েছেন। একজন সাধকের পরম আরাধ্য বিষয় হল বোধিচিত্ত বা মহাসুখ। সাধনার মাধ্যমে প্রজ্ঞারূপ শূন্যতা এবং উপায়রূপ করুণার সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলেই এই মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। দেহের অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনেই সহজানন্দের অনুভব হয়।

সহজিয়া সধনায় সাধকগণ এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণাকে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। দেহের মধ্যে তাঁরা চারটি চক্রের অবস্থান কল্পনা করেছেন। প্রথম চক্রটি নাভিতে অবস্থিত- নির্মাণচক্র, দ্বিতীয় চক্রের স্থান হৃদয়ে- ধর্মচক্র, তৃতীয় চক্রটি কণ্ঠে-সম্ভোগচক্র, চতুর্থটির অবস্থান মস্তিষ্কে সহজচক্র বা মহাসুখচক্র। এই চার চক্র ছাড়াও সাধকগন সাধনার সহায়ক হিসেবে তিনটি নাড়িও কল্পনা করেছেন। বাম নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত বামগা নাড়িটি প্রজ্ঞারূপ, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র থেকে প্রবাহিত দক্ষিণগা নাড়িটি উপায়রূপ এবং এই দুই নাড়ির ঠিক মাঝখান দিয়ে অতিক্রান্ত নাড়িটি অবধূতী বা অবধূতিকা। এই অবধূতিকায় বোধিচিত্তের সাধনা হয়। বামগা আর দক্ষিণগার গতি নিম্নগামী এদের এক ধারায় সংসারের সৃষ্টি অপর ধারায় নির্বাণ। সহজ সাধনায় এই দুই ধারার নিম্ন গতিকে রুদ্ধ করে মধ্যমার্গে একত্রিত করে উর্ধ্বগামী করা হয়। অবধূতিকাতে বাম ও দক্ষিণ নাড়ি মিলিত করার মাধ্যমে নির্মাণচক্রে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে নির্মাণচক্র থেকে বোধিচিত্তকে উর্ধ্বগামী করা হয় ধর্মচক্রে, সেখান থেকে সম্ভোগচক্র এবং সর্বশেষ মহাসুখ চক্রে প্রেরণ করতে পারলেই বোধিচিত্ত পারমার্থিকরূপ লাভ করে তাঁর মাধ্যমেই একজন সাধক মহাসুখ বা সহজানন্দের সন্ধান লাভ করেন।[৭]

সিদ্ধাচার্যগণ সাধনপ্রণালীকে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। সাধনার প্রধান অবলম্বন দেহকে কোথাও নগরী (দেহনঅরী), কোথাও রথ, কোথাও বীনা আবার কোথাও মায়াজাল রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সহজানন্দ লাভের একমাত্র উৎস হল এই দেহ। সাধনায় চক্রগুলোকে বিভিন্ন পদ্মের রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং চক্রে অবস্থিত বোধিচিত্ত যোগিনী, চণ্ডালী, শবরী, মাতঙ্গী, ডোম্বী, নৈরামনি প্রভৃতি নানা রমণীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া নাড়ি তিনটিকে কখনও কখনও চন্দ্রসূর্য, নৌকা-দাঁড়, নদীতট-সাঁকো প্রভৃতি রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।[৮]

চর্যাগীতিতে প্রথমপদেই সিদ্ধাচার্য লুইপা দুই নাড়ি একত্রিকরণের মাধ্যমে সাধকেরঅদ্বয় মহাসুখে অবস্থানের কথা প্রকাশ করেন:

ভণই লুই আম্হে ঝাণে দীঠা।

ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥[৯]

(১ নং চর্যা, রাগ-পটমঞ্জরী)

অর্থাৎ, লুই বলছেন, আমি ধ্যানের মঝে দেখেছি ধমন চমন দুই পিঁড়িতেই আমি উপবিষ্ট।

অদ্বয় সাধনপ্রণালীর ধারণা পাওয়া যায় নদী ও সাঁকো রূপকের সমন্বয়ে। যেমনঃ

ভবণই গহম গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ৷৷
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই।
পারগামি-লোঅ নিভর তরই ৷৷
ফাড়িঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।
আদঅদিঢ়ি টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ ৷৷
সাঙ্কমতচড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী ৷৷
নিয়ড্ডি বোহি দূর মা জাহী ৷৷[১০]

(৫ নং চর্যা, রাগ-গুঞ্জরী)

অর্থাৎ, ভবনদী অতি গভীর ও বহমান। নদীর দুই ধারে কাদা, মঝে থৈ পাওয়া যায় না। ধর্ম সাধনার জন্য চাটিল সাঁকো বানালেন।যাতে নির্ভয়ে পার হওয়া যায়। এই সাঁকোতে দুই পাড়ের মিলন হল। মোহতরুকে টাঙ্গী দিয়ে ফেড়ে পাটাতন বানানো হয়েছে। অদ্বয় (জ্ঞানরূপ) টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণ দৃঢ় কর। সাঁকোতে চড়ে ডান বামে ঝুঁকোনা। বোধি তোমার কাছেই আছে, দূরে যেও না।

সর্বোপরি বৌদ্ধ সহজিয়াগানের সাধনার মূল তত্ত্ব হচ্ছে দেহ সাধনা বা কায়া সাধনা। সহজযানীরা দেব-দেবী, মন্ত্র-তন্ত্র, পূজার্চনা, জপ-তপ কোনও কিছুতেই বিশ্বাসী নন। তাঁরা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:'দেহহি বুদ্ধ বসন্তও ন জাণই'। অর্থাৎ, মূর্খ তুমি জানো না দেহের মাঝেই আছে বুদ্ধ বা পরমজ্ঞান। তাঁদের কাছে শূন্যতা হল প্রকৃতি আর করুণা হল পুরুষ। শূন্যতা এবং করুণা অথবা নর-নারীর মিলনে যে মহাসুখের সন্ধান পাওয়া যায় সেটিই ধ্রুবসত্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়কামনা নষ্ট হয়ে এই ইহজাগতিক ধ্যান-ধারণা, ভেদাভেদ, সংস্কারের বিলুপ্তি হল সহজ অবস্থা। সহজ সাধকদের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রাচার নিরর্থক। সহজযানীদের ভাষায়, 'বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধও জানিতেন না- বুদ্ধোহপি ন তথা বেত্তি যথায় মিতরো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়! সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে। সহজ মতে কঠিন শাস্ত্রাচার এবং সংযম পালন মানুষের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যা মানুষের মানসিক সাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মানুষের মন সহজ স্বাভাবিক সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে চায়। তাই সহজিয়া সাধকগণ ধর্মসাধনায় মানবিক বৃত্তিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মনুষ নয়। দেহকে অস্বীকার করে দেহের স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে বর্জন করে সাধনা করলে সেটি হয় কৃত্রিম সংযম। তাই দেহের স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে অবদমিত না করে সহজ পথে সাধনা করাই সহজিয়া সাধনতত্ত্বের মূল প্রেরণা।[১১]

বৌদ্ধ সহজিয়া গান তথা চর্যা গানের প্রথম গানটিতে মানুষের দেহকে একটি তরুবা গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥

সকল সমাহিঅ কাহি করিআই।

সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥[১২]

(১ নং চর্যা, রাগ-পটমঞ্জরী)

অর্থাৎ, মানুষের দেহ তরুর মত যার পাঁচটি ডাল রয়েছে। চঞ্চল চিত্তে কালের (মৃত্যু) প্রবেশ ঘটলো। চিত্তকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও কীভাবে তা করবে। সমস্ত সমাধিতে কী করে; সুখ ও দুঃখে সে নিশ্চিত মরে (সমাধিতে সাময়িকভাবে দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া গেলেও সমাধি ভাঙ্গলে আবার সেই পূর্বের অবস্থাই ফিরে আসে।

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে গুরুবাদ একটি অন্যতম বিষয়। সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর উপর একাগ্রচিত্তে নির্ভরশীল হওয়াই গুরুবাদের মূলভাব। গুরুবাদ কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের পালিত বা আচরিত প্রথা নয়, ভারতবর্ষে প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম সাধনাতেই গুরুবাদ বিষয়টি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত বলেন, "As a matter of fact, this guru-vada may be regarded as the special characteristic, not of any particular sect or line of Indian religion, it is rather the special feture of Indian religion as a whole" [Dr. S. B. Dasgupta: Obscure religious cults, appendix (A) p. 356]।[১৩]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে গুরুবাদ প্রাধান্য দেয়ার কারণ, ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় পরম সত্যকে সাধারণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় জ্ঞানাঅতীত রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। পরম সত্যকে বাইরে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। গভীর ধ্যান ও বোধির মাধ্যমে কোন সাধক আপন অন্তরে সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান লাভ করেন। সাধারণ মানুষ নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে এই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে না এবং সত্যলাভের উপায়ও যেহেতু বধগম্য নয় সেহেতু যিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন তাঁরই উপদেশ-নির্দেশ গ্রহণ এবং পালন করতে হয়। এইভাবেই গুরুবাদের উৎপত্তি হয়েছে। ভারতীয় ধর্মসাধনায় প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বিভিন্ন প্রকার মরমিয়া ও সহজিয়া ধর্মসম্প্রদায়ে গুরুকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। গুরুবাদ নির্ভর ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, গুরুঅদ্বয় সত্যোপলব্ধির দ্বারা শিষ্যের সাথে মিলিত হন এবং অনুগামী সেই শিষ্যকে সত্যলাভের পথে পরিচালিত করেন। গুরুচর প্রতি এই একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার কারণে কখনও কখনওগুরু স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি বা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে শিষ্য বা ভক্তসম্প্রদায় গুরু সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বর সেবাতুল্য সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে গুরুবাদ বা গুরুতত্ত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই স্বীকৃতির কারণ সিদ্ধাচার্যগণ যে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত সেটির সাধ্য ও সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্যসাধনার বিষয়। তাঁদের সাধ্য যে সহজানন্দ তা সাধকের একটি গূঢ় উপলব্ধির বিষয়, বাইরে থেকে তা আদান প্রদান করা সম্ভব নয়। আবার এই সহজানন্দলাভের পন্থাও পূজা-শাস্ত্রপাঠ-জপ-তপ প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠান বিরোধী। সহজিয়া সাধনা বহুলাংশেই তান্ত্রিক যোগচার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তান্ত্রিক যোগাচারে এমন কিছু কঠিন শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া-কলাপ আছে যা পূর্বঅভিজ্ঞতা আছে এমন কোন ব্যক্তির নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়া অভ্যাস করা সম্ভব নয়। কারণ, এই ক্রিয়া-কলাপ সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে শুধু যে সাধ্য-লাভই ব্যাহত হবে তা নয়, একজন সাধক শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। তাই এই সাধনতত্ত্বে গুরুকে বিশেষ সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়ায় গুরুতত্ত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

নান্যেন কথ্যতে সহজং ন কস্মিন্নভিলপ্যতে।

আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্‌গুরুপাদোপসেবয়া।

হেবজ্রতন্ত্র পুথি, পৃ. ২২ (খ)।

অর্থাৎ পরমসাধ্য ‘সহজ’ অন্য কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, গুরুর চরণসেবার মত পূণ্যের মাধ্যমেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে ‘সহজ’ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়।[১৪]

গুরু সম্পর্কে বৌদ্ধতন্ত্রের এই সশ্রদ্ধ মানসিকতা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ফুটে উঠেছে। পরমসত্য বা সহজানন্দ সম্পর্কে সহজিয়া সাধকগণের ধারণা এই যে সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের বোধগম্য নয় এবং শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে লাভ করাও সম্ভব নয়। তখন সিদ্ধাচার্যগণ নতুন পন্থা অবলম্বন শুরু করলেন সেই পন্থাই সদগুরু বা সদগুরুবচন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে বহু সংখ্যক পদে এই গুরুবাদের কথা ফুটে উঠেছে।

প্রথম চর্যাতেই আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেছেন,

“দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥”[১৫]

(১ নং চর্যা, রাগ-পটমঞ্জরী)

অর্থাৎ, লুই বলছেন, মহাসুখকে কিভাবে লাভ করা যায় তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

২১তম পদে উল্লেখ আছে-

“তব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।

হ করিহ সো নিচ্চল॥[১৬]

(২১ নং চর্যা, রাগ-বড়ারী)

অর্থাৎ, সেই মুষিকের ততক্ষণ পর্যন্ত চঞ্চলতা যতক্ষণ না সে সদগুরু মেনে নিশ্চল হয়।

৩৫তম পদে পাওয়া যায়-

"এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁসু মোহে।
এবেঁ মই বুঝিল সদগুরু বোঁহেঁ ৷৷"[১৭]

(৩৫ নং চর্যা, রাগ-মল্লারী)

এতকাল আমি মোহে বশীভূত ছিলাম। এখন আমি সদগুরুর উপদেশে চিত্তের স্বরূপকে চিনলাম।

৪৫তম পদে উল্লেখআছে-

মণ তরুপাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আশা বহল পাতহ বাহা ৷৷
বরগুরুবঅনে কুঠারে ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ৷৷
বাটই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ৷৷"[১৮]

(৪৫ নং চর্যা, রাগ-মল্লারী)

অর্থাৎ, মনরূপ তরুতে পঞ্চেন্দ্রিয় তার শাখা-প্রশাখা এবং বাসনাসমূহ পাতা ও ফল স্বরূপ। সদগুরুর উপদেশ কুঠার স্বরূপ। এই কুঠার দিয়ে মনতরুকে এমনভাবে ছেদন করতে হবে যাতে আর কখনও উৎপন্ন হতে না পারে।

সকল প্রকার সাধন-মার্গেই গুরুর অপরিহার্যতা বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে গুরুবাদের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এখানে গুরুকে 'সহজ' লাভের উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, গুরুকে সহজ স্বরূপের বিকল্প হিসাবে দেখানো হয়নি। কারণ পরম সাধ্য তথা সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের স্বীয় অনুভূতির বিষয়, একজনসাধক তাঁর একটি নির্দিষ্ট সাধনমার্গ আশ্রয় করে এই অনুভূতি লাভ করে থাকেন। এই বিশেষ অনুভূতি সাধকগণের কাছে 'বাক্‌পথাতীত' বা বাক্যের আগোচর হিসেবে বিবেচিত। গুরুতাঁর উপদেশ বাণীর মাধ্যমে শিষ্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।[১৯]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে নারী সাধনার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সমাজে বসবাসরত নিম্নশ্রেণীর নারীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমনী (শ্মশানে শবদাহ করায় সাহায্যকারী), শবরী (শিকারি), চণ্ডালী (নিচু শ্রেণীর সম্প্রদায়) প্রভৃতি চরিত্র ফুটে ওঠে। সিদ্ধাচার্যগণ শবরী, ডোম্বী ও তাদের জীবনমানকে অবলম্বন করে পদ রচনা করেন। শবরী রমণীগণ রূপবতী ছিলেন আর ডোম্বীগণ নাচেগানে পারদর্শী ছিলেন। যে সকল সহজযানী সাধক ও কাপালিক জাতি ও সংস্কার বিরোধী ছিলেন তাঁরা ধর্মাচরণে ডোম্বীদের সঙ্গিনী হিসেবে নিতে পারতেন।

সিদ্ধাচার্য কাহ্নপা বলেন,

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥
এক সো পদমা চৌষঠঠী পাখুড়ী।
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥[২০]

(১০ নং চর্যা, রাগ-দেশাখ)

এখানে ডোম্বীকে নৈরাত্মা প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই বিষয়সুখে পূর্ণ পৃথিবী-রূপ নগরের বাইরে তার বাস। তাকে স্পর্শ করা গেলেও আয়ত্ত করা যায় না। কাপালিক সম্প্রদায় অস্পৃশ্য তাই ডোমরমণীদেরসাথে তারা সঙ্গ করতে পারে। কাহ্ন পা তাই নিজেকে কাপালিকদের সমগোত্রীয় বলে পরিচয় দেন এবং ডোমনীদের সাথে সঙ্গ করতে চান। তিনি মূলত সকল ধরণের লোকাচার ও সংস্কার মুক্ত পরিশুদ্ধ মনের অধিকারী। তাই তিনি মনে করেন নৈরাত্মার সঙ্গ লাভের মাধ্যমে নির্বাণ প্রাপ্তির অধিকার তিনি অর্জন করেছেন।

সিদ্ধাচার্য শবরপা তাঁর নিখুঁত কাব্যিক ভাষায় শবরী বালিকাদের সুন্দর কাব্যময় বর্ণনা দিয়েছেন। উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তাদের বসবাস। শবরীর খোঁপায় ময়ূরের পাখা আর গলায় গুঞ্জার মালা। এখানে শবরী জ্ঞানরূপ নৈরাত্মা গুঞ্জরমালা গুহ্য মন্ত্রের রূপক।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিন সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী ॥[২১]

(২৮ নং চর্যা, রাগ- বড়ারী)

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে দেহতত্ত্ব ও গুরুবাদ বা গুরুতত্ত্ব অন্যতম প্রধান বিষয়। সহজপন্থা অবলম্বন করে দেহসাধনার মাধ্যমে মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। আর এই সাধনায় শিষ্যকে সঠিক পথে পরিচালনা করে সহজানন্দ লাভের শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়ার দায়ীত্ব পালন করেন গুরু। তাই এই সাধনতত্ত্বে গুরুর অবদান অনস্বীকার্য। সাধনায় গুরুর সকল উপদেশাবলী মেনে চললে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধ সহজিয়াগানে নারীকে বিভিন্ন রূপকের মধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ডোমনী, শবরী ও চণ্ডালী প্রভৃতি অস্পৃশ্য নগরীর নারীদের রূপকের মাধ্যমে স্থান দেয়া হয়েছে এই গান ও সাধনায়। বৌদ্ধ সহজিয়াগানের এই সাধনতত্ত্ব বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতধারা বাউল গানের সাধনতত্ত্বের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু বৌদ্ধ সহজিয়া গান বাউল গানের শেকড় সেহেতু উভয় গীতরীতির সাধনতত্ত্বে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বাউল সাধনতত্ত্বও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার মতই যোগতান্ত্রিক সাধনা। বাউল সাধনার মূল কথাও দেহ সাধনা। সিদ্ধাগণ বলেন,"মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই..... অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোন স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।"[২১]

এ প্রসঙ্গে বিরোচনের উক্তিটি যথোপযুক্ত মনে হয়, "এই পৃথিবীতে দেহের পূজা ও পরিচর্যা করে দেহকে মহীয়ান করলেই দুই লোকে সাফল্য ঘটে।"[২২]

বাউল সাধকগণ ও একই কথাই বলেছেন:

সখি গো জন্ম মৃত্যু যাহার নাই

তাহার সঙ্গে প্রেম গো চাই

উপাসনা নাই গো তার

দেহের সাধন সর্ব সার

তীর্থব্রত যার জন্য

এই দেহে তার সব মিলে।[২৩]

কারণ এই দেহই সব কিছুর আবাসস্থল। দেহতেই কৈলাস, হিমালয় ও বৃন্দাবন আছে। দেহের অভ্যন্তরে রাধা-কৃষ্ণ বিরাজমান।[২৪]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের যে সাধনতত্ত্ব তারই ঐতিহাসিক ক্রম পরিনতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বাউল সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল সকল সম্প্রাদয়ই দেহচর্চাকেই সাধনার মূলব্রত হিসেবে নিয়েছে। নাথযোগীগণ রতিনিরোধ সাধনা করে থাকেন আর তান্ত্রিক ও সহজিয়া রতিপ্রয়োগে সাধনা করেন। উভয়ই যৌগিক প্রক্রিয়া নির্ভর। একটি রমণ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে পাওয়া জ্ঞানানুগ সাধনা, অপরটি হল বিন্দু ধারণ ও প্রণালী নির্ভর চর্যা। এটির নাম উল্টা সাধনা যার অবলম্বন হঠযোগ।

উজান উর্ধ্বগতি রতি চলিবে যাহার

সেইজন বেদবিধি হইবেক পার।[২৫]

মুসলমান সাধকগণও এই সাধনপন্থা বিশ্বাস করেন। দেহ মাঝে অবস্থিত প্রাণ ও আপন বায়ু নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হওয়াই এর মূল লক্ষ্য।

বৌদ্ধ সহজ সাধনায় যে মহাসুখ, সেটি স্ত্রী ও পুরুষের মিলন বা সংযোগ জনিত সুখ। মানুষ পার্থিব জীবনে রমণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চরমসুখের সন্ধান পায়। বৌদ্ধ মতানুসারে হেবজ্র (বজ্রসত্ত্ব) নারী যোনীতে শুক্ররূপে বাস করেন। শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব মতেও পাওয়া যায়-

ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষশক্তি

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়েও এই মত ও সাধনপন্থা প্রচলিত রয়েছে।[২৬]

বাউল সাধনায় নির্দিষ্ট কোন মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়না। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর প্রভাব পড়েছে এই বাউল সাধনায়। তাই বাউল সাধনায় অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাউল কণ্ঠ গেয়ে ওঠে-

নানাবরণ গাভীরে ভাই

একই বরণ দুধ

জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম

একই মায়ের পুত।[২৭]

বাউল সাধনা মিথুনাত্মক যোগসাধনা। বাউল গানের সাধনতত্ত্বে দেহতত্ত্ব প্রধান। বাউল সাধনায় বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব ও মুসলিম সকল ধর্মেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। বাউল সাধনা দেহবাদী সাধনা। দেহই বাউল সাধনার প্রধান আশ্রয়। দেহকে আশ্রয় করেই তাঁরা মনের মানুষের সন্ধান করেন। বাউল সাধনার ক্ষেত্রে যোগ, মৈথুন ও গুরু এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।গুরুর দেখানো পথ অনুসরণ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহকে পোক্ত করে বিন্দু ধারণের মধ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা বাউল সাধকদের মূল লক্ষ্য।[২৮]

বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব

দেহস্থান	কায়/চক্র	পদ্ম	দল
১. নাভি	নির্মাণ	নাভি	৬৪
২. হৃদয়	ধর্ম	হৃৎ	৩২
৩. কণ্ঠ	সম্ভোগ	কণ্ঠ	১৬
৪. মস্তক	সহজ	উষ্ণীষ	৪

বৌদ্ধ মতানুসারে গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা, এই শূন্যতাই নির্বাণ।

হিন্দু দেহতত্ত্ব

দেহস্থান	চক্র	পদ্মদল
১. গুহ্য ও জনন-ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	মূলাধার	৪
২. জনন-ইন্দ্রিয়ের মুলে সুষম্ণাস্বাধিষ্ঠান	মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ী	৬
৩. নাভি মূল	মণিপুর	১০
৪. বক্ষ	অনাহত	১২
৫. কণ্ঠ	বিশুদ্ধ	১৬
৬. ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল	আজ্ঞাচক্র	২

এর উপরে আছে সহস্রদল পদ্ম। যার নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সাথে পরমশিবের মিলন হয় এখানেই। কুণ্ডলিণী হচ্ছে সাড়ে তিনটি চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প বিশেষ। এটি রজঃবিষ বা কাম বিষের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। সাধনার মাধ্যমে অমৃতে পরিনত করে স্থায়ী আনন্দ লাভ করাই একজন সাধকের মূল উদ্দেশ্য।[২৯]

বাউল সাধনা রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হলেও এটিই বাউলদের জীবনের একমাত্র উপায় নয়। বাউল সাধনা প্রেমের মাধ্যমে কামহীন অনুভবের আস্বাদন প্রক্রিয়া। এই সাধনা এমন এক যুগল সাধনা যেখানে সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে কামভাব দমন করে প্রেমভাব জাগ্রত করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হয়। এই সাধনতত্ত্বে একজন সাধককে ধৈর্যশীল এবং দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হতে হয়। নারীর প্রতি লোভহীন হয়ে সাধনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে হয়। বাউল সাধনায় দেহতত্ত্বের দুটি ধারা রয়েছে। একটি পরকীয়া মৈথুনাত্মক অপরটি হঠযোগ নির্ভর বামহীন সাধনা। বামাচারী বাউল সাধনায় দেহই সাধনার প্রাণ কেন্দ্র। বাউল সাধনতত্ত্বে নারীকে প্রকৃতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রকৃতিই সকল সৃষ্টির মূল বা আদি শক্তি হিসেবে বিবেচিত। পুরুষও প্রকৃতির মিলন ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রজঃ-এ প্রকৃতির সত্তা নিহিত এবং পুরুষেরসত্তা বীজে। এরা একে অপরের পরিপূরক। দেহ অভ্যন্তরে রজঃ শক্তির সঙ্গে মস্তকে সহস্রদল পদ্মে বীজরূপ পরমাত্মাঅবস্থিত। রজঃ প্রবর্তন করার সময়ে বীজ মস্তক থেকে নেমে রজঃ-এর সাথে মিলিত হয়ে মুলাধারে এসে আত্মপ্রকাশকরে। বাউল সাধকগণ এই সময়কে মহাযোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাউল ফকিরগণ মূলাধারকে অটল বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের ধারণা মহাযোগেরসময় অটল বৃক্ষে দুটি ফল ধরে। একটি সাদা অপরটি লাল। একটি মাতারূপে অপরটি পিতারূপে বিদ্যমান। এর মাধ্যমেই অটল মানুষ মনের মানুষ ও সহজ মানুষের প্রকাশ ঘটে।

পাঞ্জুশাহ্‌র একটি গানে মহাযোগের অবস্থান বিবৃত হয়েছে-

ধরা যায়রে অধরে
যদি নিষ্ঠা হয় স্বরূপদ্বারে
মূলাধার সেই অটল বৃক্ষ তাহে দুটি ফল ধরে ॥
লাল শ্বেত দুটি ফুল পিতামাতা নাম ধরে।
অটলের বরাতি মানুষ গড়েছে ফল মৈথুন করে ॥
অটল মানুষ নিজরূপে স্বরূপে সে রঙ ধরে।
পিতামাতা পদ্মফুলে ভাসছেন সমুদ্রে ॥
মহাযোগে সমুদ্রে অটল রূপ ঝলক মারে।
পাঞ্জ বলে, তীর-ধারে ধর ভাটা জোয়ারে ॥[৩০]

মূলাধার বলতে দেহের সর্বনিম্নের চক্রকে বোঝানো হয়। মহাযোগের স্থিতি তিন দিন। চতুর্থ দিনে রজঃ পুনরায় সহস্রদল পদ্মে গমন করে। এই তিন দিনই হল সাধনার চরম সময়।[৩১]

বাউল সাধনা মিথুনাত্মক যোগসাধনা। বাউল গানের সাধনতত্ত্বের অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয় হল কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনা। ধারণা করা হয় বাউল সম্প্রদায় রাগপন্থী। বাউলগানের সাধনতত্ত্বে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। চারিচন্দ্র-ভেদ অথবা মিন-ধরা এই রূপকের মাধ্যমে বাউল গানের সাধনতত্ত্বের মূল বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। মৈথুনতত্ত্ব বলতে মূলত সার্বজনীন জৈবিকতত্ত্বকে বোঝানো হয়। ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস এবং সেমেটিক দর্শনের (আরবি ধর্ম শাস্ত্র) ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানব-মানবী অথবা আদম-হাওয়ার কাহিনীর মধ্যেও এই মৈথুনতত্ত্ব নিহিত। শুধু মানুষই নয়, সমগ্র জীবজগৎ এ তত্ত্বের আওতাধীন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মৈথুনতত্ত্ব প্রক্রিয়াটি মূলত সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন একটি জৈবিকতত্ত্ব বা প্রক্রিয়া। বাউল সাধনায় মৈথুনতত্ত্বকে সংযম সাধনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পন্থা হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। বাউল সাধনা মানব সাধনা, প্রেম সাধনা। প্রেম সাধনার মাধ্যমে বাউল সাধকগণ অসীমকে সীমায় বোধগম্য করতে সচেষ্ট। বাউলগানের সাধনতত্ত্বে চারিচন্দ্র ভেদতত্ত্ব একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। 'তিরাপিনির তীর ধারে মীনারূপে সাঁই বিহার করে'- বাউলের 'অধর মানুষে'র এই হলো গুপ্ত পরিচয়।[৩২]

বাউল গানের প্রবাদপুরুষ লালন সাঁই তাঁর গানের মাধ্যমে এই মীনরূপ সাঁইকে ধরার প্রয়োজন ও কৌশল বর্ণনা করেছেন।

সময় বুঝে বাঁধন বাঁধলে না

জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবিরে মনকানা

মাস-অন্তে মহাযোগ হয়

নীরস হতে রস ভেসে যায়

করিয়ে সে যোগের নির্ণয়

মীনরূপে খেল্ দেখ্লে না ॥

পুরুষ এবং প্রকৃতির বিশেষ একটি প্রক্রিয়াগত মিলনধারাকে আশ্রয় করে এই মীনরূপ সাঁইকে ধরতে হয়। নারীদের ঋতুস্রাবের প্রথম দিবস থেকে শুরুকরে তৃতীয় দিবসের মধ্যাকার সময়টি হল এই মীন ধরার উৎকৃষ্ট সময়।

সাঁইজি বলেন-

যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে

মহা মহাযোগ সেই জানতে পারে

ও সে তিন দিনের তিন মর্ম জেনে

এক দিনেতে সেধে লয় ॥

বাউল সাধকগণ ঋতুস্রাবের এই তিন দিনের বিশেষ সময়সীমাকে অমাবস্যা বলেও অভিহিত করেন। লালন সাঁই তাঁর গানে লিখেছেন-

মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়

অমাবস্যা মাস অন্তে হয়

অমাবস্যা পূর্ণিমার নির্ণয়

জানতে হবে নিহার করে ॥

লালন সাঁই আরও বলেন-

রস-রতি অনুসারে

নিগুড় ভেদ জানতে পারে

রতিতে মতি ঝরে মূল খণ্ড হয় ॥

বাউল সাধনার পথ সহজ ও সুগম নয়। যৌন-সম্ভোগ চিন্তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে যৌন-সংযম তথা কাম-নিয়ন্ত্রণই বাউল সাধনতত্ত্বে মোক্ষ লাভ করার উপায়। সাধনার ক্ষেত্রে রিপু দমন করতে না পারলে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়।[৩৩]

বাউল সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-

> "আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে আসছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি। এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এ মিলনে সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই মিলনে গান জেগেছে। সেই গানের ভাষা ও সুর মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়। বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল, কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু- মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৩৪]

তিনি '*আত্মবোধ*' প্রবন্ধে বাউলমত ও সাধনা সম্পর্কে চমৎকার এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

> "কয়েক দিন হল পল্লী গ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমায় বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর একজন বললে, 'বলা যায় বই কি- কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাস করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে আসবে। সবাইকে আসতে হবে।"[৩৫]

বাংলার বাউল সম্প্রদায় একটি গুরুবাদী বা পীরবাদী সম্প্রদায়। এইগুরুবাদ বা পীরবাদ নানাবিধ সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণার মিশ্র মতবাদ। প্রত্যেক বাউলই স্বাধীন চিন্তাশীলতার অধিকারী একজন ব্যক্তি। বাউল সাধকগণ পৃথক চিন্তাশীল ব্যক্তি হলেও, সকলের চিন্তাধারায় একটি বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাউল গান ও সাধনতত্ত্বে মুর্শিদতত্ত্ব, পিরতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্বের প্রাধান্য রয়েছে। বাউল গান একাধারে মরমী গান, বৈরাগ্য ও সংসার বিমুখতা ও তত্ত্বের গান, ভাবগান, মারফতের গান প্রভৃতি হিসেবে বিভিন্নস্থানে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে 'বাউল' সম্প্রদায় 'ফকীর' নামে পরিচিত এবং তাঁদের সৃষ্ট গানগুলো 'মারফতী' বা 'মুর্শিদা' গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উত্তরবঙ্গে 'বাউল' গান দেহতত্ত্বের গান নামে পরিচিত এবং পশ্চিম বঙ্গে 'বাউল' গান হিসেবেই পরিচিত। বাউল ধর্ম ও সাধনতত্ত্বে সাধনায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিন্দু বাউল সম্প্রদায় ও হিন্দু জনসাধারণের কাছে গুরু নামে পরচিত। মুসলমান বাউলসাধক ও জনসাধারণের কাছে মুর্শিদ, পীর, ফকীর, কামেল ফকীর, দরবেশ, কুতুব প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাউল তথা 'দেহতত্ত্ব' মূলক গানে তান্ত্রিক যোগ ও বৈষ্ণব এবং সূফী প্রভাব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাউল গানের সাধনততত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে যোগ, তান্ত্রিক, 'বৈষ্ণব ও সূফী ভাব দেখা যায়। দল, সম্প্রদায় ও মত ভেদে বাউল সাধনার তত্ত্বজ্ঞানে একজন ব্যক্তিকে পারদর্শী হতে হয় ।বাউল সাধকগণ গুরুবাদী। আদিকাল থেকেই মানুষ সাধারণত দৈহিক শুচিতাকে মানস-শুচিতার সহায়ক মনে করে গুরুর সাহায্যে দেহতত্ত্বের সাধনা করে আসছে। সংখ্যা ও যোগ, বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে এমন কি সূফী সাধন তত্ত্বেও দেহকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং গুরুর আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশে মেনে চলার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে।

এভাবেই বাউলধর্ম, ও সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়া ও গুরুর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গানেও গুরুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বাউল সাধকগণ হৃদয়ের মধ্যাকার পরম সত্তা, পরম ইচ্ছা, পরম চিন্তা ও পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করেন এবং সেই পরম সুন্দর বিভিন্ন রূপক বা উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। বাউলগানে যেমন বৌদ্ধ সহজিয়া ও সূফী-তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে তেমনি হিন্দু তন্ত্র, বৈষ্ণব সহজিয়া গুরুবাদের প্রভাব আছে। বাউল সাধনা দেহ ভিত্তিক এমন এক অধ্যাত্ম সাধনা যেখানে মানুষ ও তার সৃষ্টার মধ্যে বন্ধনহীন সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে গুরু, পীর বা মুর্শিদ। মুসলমান বাউল সাধকগণ তত্ত্বজ্ঞান সাধক। তাঁরা গুরু বা পীরের কাছ থেকে তত্ত্ব কথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ ও তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা করতে শেখেন। বাউল দর্শন ও সাধনাত্তত্বের মূল লক্ষ্য এটি। তত্ত্ব-সাহিত্যের প্রাধান বিষয় 'আত্ম তত্ত্ব'।

'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'[৩৬]

অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার 'চৌদ্দ পোয়া' দেহ আছে যার মধ্যে বর্তমান জীবাত্মা, পরমাত্মা, ষড় রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, ছয় বা দশ লতীফা, পদ্ম, চক্র, দায়রা, নাড়ী, বায়ু প্রভৃতি। এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য পীর বা মুর্শিদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। অসীম স্রষ্টাকে সীমার মাঝে মানব হৃদয়ে আবিষ্কার ও প্রত্যক্ষ করতে হলে মুর্শিদের শরণাপন্ন হতে হয়। অসীম স্রষ্টা 'নূর', আর 'নবী' নিজে বলেন, 'আমিআল্লাহরনূর থেকে সৃষ্ট এবং জগতের তামাম বস্তু আমার নূর থেকে সৃষ্ট' অর্থাৎ সমস্ত কিছুর মূলে নূরসত্তা বা নূরতত্ত্ব বর্তমান। মুর্শিদ এই নূরতত্ত্বের সন্ধান জানেন তাই স্রষ্টাকে পাওার জন্য মানুষরূপী পীর বা মুর্শিদকে ভজন করতে হয়, তাঁর সেবা করতে হয়। বাউল সাধনায় গুরুভক্তি বিশেষ স্থান পেয়েছে তবে বাউলরা গুরুভক্তি ও ভজনা করেছেন। হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকীরদের গুরুত্ব বা পীরতত্ত্ব অতি গভীরে নিহিত, যা জানতে ও উপলব্ধি করতে হলে

গভীর সাধনার প্রয়োজন। পীর, মুর্শিদ বা গুরুর সাহায্যে বাউলরা যে সাধনা করে থাকেন সে সাধনার মূল লক্ষ্য 'মনের মানুষ' ধরার সাধনা। বাউল সাধকগণের বিশ্বাস এই মানুষের মধ্যেই মনের মানুষ, প্রেমের মানুষ, ভাবের মানুষ, অচিন মানুষ, মানুষ রতন, সোনার মানুষ, অচিন পাখি প্রভৃতি সত্তা চিরসত্যরূপে সর্বদা বিরাজমান।[৩৭]

বাউল গানের সাধনতত্ত্বে মানুষতত্ত্ব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাউলমতবাদ তথা বাউল সাধনার একটি আদর্শিক ভিত্তি হল মানবতাবাদ। বাউল ধর্ম মানবধর্ম। মানুষের সাধনাই বাউল সাধনার মূলউপজীব্য।

লালন সাঁইজি মানুষতত্ত্বের কথা তাঁর সৃষ্ট গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন-

মানুষে মানুষ গাথা

গাছে যেমন আলোকলতা।

জেনে শুনে মুড়াও মাথা

জাতে উঠবি।

মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি ॥

বাউল মতে মানুষতত্ত্ব প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন,

> "কোনো অনুমানাত্মক কিছুকে তারা মানে না, তাদের মতে শাস্ত্র পুরাণ দেব মূর্তি মন্ত্র তীর্থ উপবাস এ সব আসলে অনুমান, এই ইহজগৎ আর কামনা-বাসনা, স্বপ্ন ও মুক্তি পিপাসা রয়েছে এর পরতে পরতে-রহস্য ও মরমিয়া বিশ্ব। খোদা বা ঈশ্বর আছেন মানব জীবনের শরিফ হয়ে, তাই মানুষ ধরে সাধনা করতে হবে।"[৩৮]

তাঁদের গানে বলা হচ্ছে:

মানুষ হয়ে মানুষ জানো

মানুষ হয়ে মানুষ চেনো

মানুষ হয়ে মানুষ মানো

মানুষ রতন ধন।

কর সেই মানুষে অন্বেষণ ॥[৩৯]

মানুষতত্ত্ব যার মনে সত্যরূপে ধরা দেয়, সে অন্য তত্ত্ব কেন মানবে? কেন সে স্বর্গ-নরক ধারণায় বিচলিত হবে। তখন প্রশ্ন ওঠে-

আল্লাহর বাড়ি যদি মাটির দুনিয়া হয়

তবে মানুষ মরে কোন্ বেহেস্তে যায়?[৪০]

বেহেস্ত বা স্বর্গ প্রাপ্তি যদি কাঙ্ক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে একজন সাধকের মূল লক্ষ মানুষের মুক্তি। সেই মুক্তি মানে মোক্ষলাভ নয়, সেই মুক্তি মূলত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি। একজন গুরুই সাধককে সেই মুক্তি লাভের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তাই বাউল ফকিররা বহুলাংশেই গুরুবাদী।[৪১]

বাউল ধর্ম গুরুবাদী লৌকিক ধর্ম। গুরু বিনা সাধন-ভজন নিরর্থক। তাই বাউল মানসে গুরুর অবস্থান অতি উচ্চে। 'গুরুকে তারা দুইরূপে দেখে- মানবগুরু রূপে আর পরমতত্ত্ব বা ভগবানরূপে। তাদের গানে দুই রূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানব গুরুর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা না হলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয়না। মানব গুরু সেই পরম গুরুরই প্রতিনিধি।'[৪২]

বাউল গানের সাধনতত্ত্বে গুরুকেই সার্বভৌম শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গুরুই একজন সাধকের পরম পূজনীয় ও অবলম্বন স্বরূপ। বাউল গানে গুরুর মুল্য ও মর্যাদা অনেক উচ্চে। গুরুর কথা অমান্য করলে অন্তিম লগ্নে বিপদ হয়। অধিকাংশ বাউলগানেই গুরুবন্দনা রয়েছে। যেটি বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বৌদ্ধ সহজিয়া গেনেও গুরুর প্রাধান্য পরিলিক্ষিত হয়। গুরুই একজন সাধককে সাধনার সঠিক পথ প্রদর্শন করে মহাসুখে লাভ করার সুযোগ করে দেন।

থাকো রে মন একান্ত হয়ে

গুরু গোঁসাইয়র বাক্য লয়ে ॥[৪৩]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে গুরুকে যেমন ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়, বাউল গানের অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা ও গুরুকে অভিন্ন কল্পনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় গুরু ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি।

গুরু বা মুর্শিদতত্ত্বের কথা এই গানটির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মুর্শিদ বিনে কি ধন আর আছে রে জগতে।

মুর্শিদের চরণ-সুধা

পান করিলে হরে ক্ষুধা

কোরো না দেলে দ্বিধা

যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা

বোঝ অলিয়ম মুরশেদা

আয়েত লেখা কোরআনেতে ॥[৪৪]

বাউল গানের সাধনতত্ত্বের মূল বিষয়টি হল দেহসাধনা বা দেহতত্ত্ব। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বেও এর অনুরূপ। বাউল সাধনায় মানব দেহকেই পুন্যতীর্থ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বাউল সাধনায় যে দেহতত্ত্বের বিষয়টি এসেছে সেটি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনারই একটি রূপ। বাউল গানের সাধনতত্ত্বে যে গুরুতত্ত্বের পরিচয় পাওায় যায় সেটিও বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সাধনতত্ত্বে রয়েছে। দেহতত্ত্ব এবং গুরুপদেশ বৌদ্ধ সহজিয়া গান এবং বাউল গানের সাধনতত্ত্বের মূল বিষয়।

তথ্য সূত্রঃ

১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ৮৩-৮৪
২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*,বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৯২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৪. এবাদত হসেন, *চর্যা-পরিচিতি*,বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী, ১৯৭০, পৃ. ১১-১২
৫. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*,বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২০৫
৬. ড. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫৭-৫৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৮. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড,ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ.১৪৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২
১১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫
১২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৪৫
১৩. ড. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬-১৯৭
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩
১৯. ড. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭৩-৭৪
২০. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৪৫
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬
২২. রায়হান রাইন (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২১, ২২২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩
২৭. আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৪
২৮. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৫
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৩০. রায়হান রাইন (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২৪
৩১. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৪-১৪৭

৩২. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৭-৬৮

৩৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, দ্বি-স, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ২৮৯

৩৪. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬২

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৩৬. ড. মো.আব্দুল করিম মিয়া (সম্পাদিত), *বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন প্রথম খণ্ড*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৫৪

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৫৫

৩৮. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫৮

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪০. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫৯

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৪৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৭

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের ভাষা, সুর বৈচিত্র্য ও ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

তৃতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানের ভাষা, সুর বৈচিত্র্য ও ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষা কি? সেটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষা যে বাংলা এটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন এমন নয়। তবে ভাষা বিচারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষা বাংলা। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ ও পদ পাওয়া যায় যেখানে আসামী, উড়িয়া, বা হিন্দী ভাষার ব্যাবহার রয়েছে। কিন্তু সেটি সীমিত তাই সমগ্র রচনার ইতিহাসে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ পন্ডিতগণ মনে করেন বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষা মূলত বাংলা। তবে ড.মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ধারণা করেছেন যে শান্তিপাদ ও আচার্যদেব তাঁদের ভাষা যথাক্রমে মৈথিলী ও উড়িয়া হতে পারে। কিন্তু অন্য সকল রচয়িতার ভাষা নিঃসন্দেহে বাংলা।[১]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষা বাংলা বলে প্রমাণিত হলেও এখানে অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এখানে বাংলা ভাষা অপভ্রংশথেকে রূপ লাভ করলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। রচয়িতাগণের মধ্যে অনেকেই অপভ্রংশ ভাষায় পদ রচনা করেছেন। তাঁদের বাংলা রচনায় প্রাকৃত বা অপভ্রংশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ সহিজিয়া গানের ভাষায় কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।[২]

- বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণ এবং ব্যাঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সংস্কৃত শব্দের বানানের ক্ষেত্রে সবসময় একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। যেমনঃ সব, শবর।
- আধুনিক বাংলার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উচ্চারণ বৌদ্ধ সহজিয়া গানে দেখা যায় না। তখন হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম ছিল না। যেমনঃ পঞ্চ-পাঞ্চ।
- শ, ষ, স এই তিনটি বর্ণের পার্থক্য ছিল না। যেমনঃ শবর, ষবরালী, সবর। ঠিক সেভাবেই ন, ণ এবং জ, য এই বর্ণের মধ্যেও পার্থক্য নেই।
- বৌদ্ধ সহজিয়া গানে য়- শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার ছিল।
- অপভ্রংশের প্রভাবে পুংলিং-স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহার ছিল। তবে ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়না।
- বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষায় শব্দরূপের গঠনের ক্ষেত্রে একবচন এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। সম্বন্ধ ছাড়া পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।
- একবচনে কর্ত্রী, কর্ম, করণ এবং অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রে কোন বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়নি। যেমন- সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
- বহুবচন বোঝানোর ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক শব্দের ব্যাবহার ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সজল সমাহিঅ। সংখ্যাবাচক শব্দের বহুবচনের উদাহরণ- পঞ্চ বি ডাল। বিশেষণ পদের দিত্ব ব্যবহারে উদাহরণ দেয়া যায় উঞ্চা উঞ্চা পাবত।

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়েছে। এই 'সন্ধ্যাভাষা' বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেছিলেন আলো আঁধারি ভাষা। কিছু আলো, কিছু অন্ধকার, কিছুটা বোঝা যায় , কিছুটা বোঝা যায় না। 'কিছুটা বোঝা যায় না' কথাটি সাধারণভাবে যারা তন্ত্রধর্মে বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তন্ত্রধর্মে

যারা বিশ্বাস করে এবং দীক্ষিত তাদের জন্য এ ভাষার সব কিছুই স্পষ্ট এবং বোধগম্য হওয়া উচিৎ। এ ক্ষেত্রে বিধুশেখর শাস্ত্রী 'সন্ধ্যাভাষার' ভিন্ন ব্যাখ্যাদিয়েছেন। তার মতে, "সমপূর্বক ধা ধাতু ঙ প্রত্যয় করে 'সন্ধ্যা' হয়েছে তিনি মনে করেন 'সন্ধ্যা' বানান লিপিকর প্রমাদ।[৩] ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীও বিধুশেখর শাস্ত্রীর এই মতকে সমর্থন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন,

> "সে ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষা শুধু 'মৌলিক' 'সম্পূর্ণ' 'নিগুঢ়' সত্যেও কথা বলে, কিন্তু যাতে মৌলিক, সম্পূর্ণ, নিগুঢ়ই হোক না কেন সে ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ ভাষায় যাহা 'অভিপ্রায়িক' অর্থাৎ আপত যে অর্থ কোনো বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগুঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ উদিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে ভাষার মৌলিক উদিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়।"[৪]

ম্যাক্সমুলার 'সন্ধ্যা' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন প্রচ্ছন্ন অর্থে। এই শব্দটির সাথে রহস্য বা দুর্বোধ্যতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার নিগুঢ় তত্ত্ব সাধারণ মানুষের যাতে বোধগম্য না হয় সেজন্য কিছু স্থুল অর্থযুক্ত সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- চন্দ্রসূর্য, আলি-কালি, ডোম্বী, শবরী, শাশুড়ি-ননদী, গঙ্গাযমুনা প্রভৃতি। এই শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে সাধনার রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই ভাষায় বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গোপন সধনপ্রণালীর আভাস পাওয়া যায়। মুনিদত্ত সংস্কৃত টীকার মাধ্যমে এই সন্ধ্যাভাষাকে বোধগম্য করার প্রচেষ্টা করেছেন।[৫] সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ এভাবে মন্তব্য করেছেন, "আলো-আঁধারি, অভিসন্ধি, অনুধ্যান, ব্যঙ্গার্থ, গূঢ় অর্থ, সাংকেতিক অর্থ প্রভৃতি ব্যঞ্জক বা বাচক গুপ্ত মহাভাষার নাম সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা- এটুকু জানা গেল। তবে সন্ধ্যাভাষা যে দ্ব্যর্থক ও রূপকাত্মক সে বিষয়ে মতানৈক্য নেই।"[৬]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে তন্ত্রের সাধনা ছিল গুপ্ত। এই সাধনা সাধারণ মানুষের দ্বারা যাতে বিকৃত না হয় সেকারণেই সন্ধ্যাভাষা ব্যবহৃত হত। তাই বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আক্ষরিক দিক থেকে এক ধরণের অর্থ এবং যোগসাধনার দিক থেকে অন্য অর্থ দাঁড়ায়।

মারি সাসু ননন্দ ঘরে সালী।

মাঅ মারি কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥

(কৃষ্ণাচার্য পা, ১১ নং পদ, রাগ- পটমঞ্জরী)

উক্ত পদের আক্ষরিক অর্থ ঘরে শাশুড়ি ননদ শালী মেরে এবং মাকে মেরে কাহ্ন কাপালিক হল। কিন্তু সাধনার ভাষায় সাসু শব্দের অর্থ শ্বাস, ননন্দ শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দদানকারী ইন্দ্রিয়াদি, সালী শব্দের অর্থ নিঃশেষ, মাঅ অর্থ মায়া এবং মারি অর্থ নিস্বভাবীকৃত। যোগসাধনার ভাষায় শ্বাস নিরুদ্ধ করে, ইন্দ্রিয়কে নিঃশেষিত করে, মায়া এবং চেতনাকে নিঃস্ব করে কাপালিক হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবেই বৌদ্ধ সহজিয়া গানে শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থের আড়ালে সাধনা ও যোগের গুঢ় অর্থ নিহিত থাকে। সহজিয়া সাধকগণ এভাবেই সাধনার বানী বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।[৭]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সাধারণ অর্থ ও সন্ধ্যা অর্থ পাশাপাশি দেখানো হল।[৮]

মূলশব্দ	**সাধারণ অর্থ**	**সন্ধ্যা অর্থ**
আলি-কালি	স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ	প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস
গঙ্গা	একটি নদী	গ্রাহ্য
চৌষট্টি কোঠা	দাবার ছকের ৬৪ঘর	নির্মাণচক্র
চান্দ	চাঁদ	প্রজ্ঞাজ্ঞান বা গ্রাহ্যভাব
ডোবী	ডুমণী, নৈরাত্ম	শক্রনাড়িকা
নাবী	নৌকা	বোধিচিত্ত
পুলিন্দা	মাস্তুল	নিরুপাধিত্ব (বা নপুংসক)
বড়িআ	দাবার বোড়ে	একশো ষাট প্রকৃতি
বামহ	ব্রহ্মা	বিটনাড়িকা, বিষ্ঠানাড়ী
মূসা	মূষিক	চিত্তপবন
যমুনা	একটি নদী	গ্রাহক
সবর	শবর পুরুষ	বজ্রধর, হেরুক
সবরী	সবর–স্ত্রীলোক	নৈরাত্ম
সসহর	শশধর, চন্দ্র	শক্র
সূজ	সূর্য	অদ্বয়জ্ঞান গ্রাহকভাব
হর শিব	শক্রনাড়ীহরি	বিষ্ণু মূত্রনাড়ী
হরিণ	হরিণ	চিত্ত
হরিণী	হরিণী	নৈরাত্মা
বারুণী	মদ্য	সংবৃত্তি বোধিচিত্ত
দুলি	কচ্ছপ	মহাসুখকমল

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের সুর বৈশিষ্ট্যে ছন্দ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বৌদ্ধ সহজিয়া গান যখন রচিত হয় তখন রচয়িতাগণের নিকট দুইটি ছান্দসিক আদর্শ বর্তমান ছিল। একটি অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ এবং অপরটি লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দ। দুটির মধ্যে অপভ্রংশের ছন্ধকেই রচনায় গ্রহণ করেছিলেন। এই ছন্দের মধ্যে পাদাকুলকই সর্বপ্রধান। অপভ্রংশ শাস্ত্রে পাদাকুলক ছন্দরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'লহুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা' এখানে বোঝানো হয়েছে পাদাকুলকে লহুগুরু অক্ষরের ক্ষেত্রে স্থাপনা সম্পর্কে কঠোর কোন নিয়ম নেই। এখানে চারটি পাদ বিদ্যমান, প্রতিটি পাদে ১৬ মাত্রা এবং ৮ মাত্রার পরে যতিপাদ ঘটে থাকে।[৯]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ব্যবহৃত অপর একটি ছন্দ হল পজঝটিকা ছন্দ। এই গীতরীতিতে পজঝটিকা ছন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ছন্দে প্রতিটি চরণ ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট হয় এবং প্রতিটি চরণে চারটি পর্ব থাকে। প্রতি পর্বে থাকে চারটি মাত্রা। পাদাকুলক ছন্দের সাথে এই ছন্দের সাদৃশ্য রয়েছে। পাদাকুলক ছন্দেও প্রতি চরণ ১৬-মাত্রাবিশিষ্ট এবং পর্বগুলি ৪ মাত্রার। পজঝটিকা ও পাদাকুলক ছন্দের উদাহরণ নিম্নরূপ:

সংস্কৃত পজঝটিকা নলিনী/দলগত/জলমতি/তরলিং

তদ্ধ/জীবন/মতিশয়/চপলম

প্রাকৃত পাদাকুলক সো জর্ণ/জণমউ/সোগণু/মন্তউ

জে কর/পর উব/আর হ/সন্তউ

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ছন্দে এই প্রভাব রয়েছে। তবে এসব ছন্দের ক্ষেত্রে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের মাত্রা-গণনা করার যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ছন্দে সেটি নেই। সেখানে দীর্ঘস্বর কষনও দুইমাত্রা আবার কখনও এক মাত্রাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ঠিক সেভাবেই হ্রস্বস্বরকেও কোনো কোনো স্থানে টেনে দুইমাত্রা করে নিতে হয়।

অঙ্গন/ঘর পণ/সুন ভো বি/আতী

কানেট/চোরে/নিল অধ/রাতী।

সসুরা/নিদ গেল/বহুড়ী/জাগই

কানেট/চোরে নিল/কাগই/মাগই।

এখানে স্বরের মাত্রা গণণার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে না। দ্বিতীয় চরণে 'চোরে' ৪ মাত্রা, আবার চতুর্থ চরণে দুই মাত্রা: প্রথম চরণে সেটি একমাত্রা। পুনরায় দেখা যাচ্ছে-

রাতি/ভইলে/কামর/জাই

এই চরণটিতে হ্রস্ব স্বরকেও টেনে দুইমাত্রা করে নেওয়া হয়েছে। এরকম উদাহরণ বৌদ্ধ সহজিয়া গানে পাওয়া যাবে।[১০]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সুনির্দিষ্ট গণনা-পদ্ধতি এখানে মেনে চলা হয়নি। পন্ডিতগণ ধারণা করেছেনএই ছন্দই পরিবর্তিত হয়ে মধ্যযুগে পয়ার ছন্দের উদ্ভব ঘটেছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের বহু পদের ছন্দেই পয়ার ছন্দের রূপের সাথে মিলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ-

কমল কুলিশ ঘান্টি/করহ, বিআলী

অথবা

তরঙ্গেতে হরিণার/খূর নদীসই

অথবা

অবণাগবণে কাহ্/বিমণা ভইল।

অথবা

আলো ডোম্বি তোএ সম/করিব মোমাঙ্গ

(গুণ্ডরীপা, ৪ নং পদ, রাগ- অরু)

উপর্যুক্ত চরণগুলো বিশুদ্ধ পয়ার ছন্দ। কিন্তু এগুলো ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরকে দীর্ঘ করে নেওয়া হলে বৌদ্ধ সহজিয়া গানের অধিকাংশ পদই পয়ার ছন্দের সমগোত্রীয় হয়ে যায়।

কাআ তরুবার/পাঞ্চ বি ডাল

চঞ্চল চাত্রী/পইঠা কাল

দিঢ় করিঅ মহা/সুহ পরিমাণ

লূই ভণই গুরু/পূছি অ জান

(লুইপা, ১নং পদ, রাগ- পটমঞ্জরী)

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রক্ষা করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন পদ্যে পয়ার ছন্দ ব্যবহার করা শুরু হতে লাগল তখন বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গীর প্রভাবে কোনো স্বরই আর দীর্ঘ থাকল না । সাধারণ পদ্যও যেহেতু সুরের মাধ্যমে পরিবেশিত হত, তাই সেই সুরে চরণের শেষে টানা হয়ে দীর্ঘ হয়ে যেত। সে কারণে পয়ার ছন্দের শেষার্ধে আট মাত্রার পরিবর্তে ছয় মাত্রা হয়ে গেল।[১১]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ১৬ মাত্রার ছন্দের পরেই বেশি পাওয়া যায় ছাব্বিশ মাত্রার ছন্দ। তবে কোথাও কোথাও দইুমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ মাত্রা হয়েছে। আবার কোথাও দইু মাত্রা কমে ২৪ মাত্রা হয়েছে।

উষ্ণা উষ্ণা / পাবত তহি / বসই সবরী / বালী

মোরঙ্গি পীচ্ছ / পরিহাণ সবরী/গবীত গঞ্জের/মালী

৮+৮+৮+৪

এই ছন্দের সাথে 'মরহট্টা' ছন্দের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে।

কিন্তো মন্তে/কিন্তে তন্তে/কিন্তোরে ঋণব/খাণে

২৬ মাত্রার পদ-

সূনো পন্থর / উহ ন দীসই / ভান্তি ন বাসসি জাঅন্তে

এথা আঠ মহা / সিদ্ধি সীঝই / উজু বাট জাঅন্তে

৮+৮+১০

২৪ মাত্রার পদ-

গঅণত গঅণত / তইলা বাড়ী / হিএ কুরাড়ী

৮+৮+৮

ধারণা করা হয় এই সকল দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট পদই পরবর্তী সময়ে ত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল।[১২]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের কলিবিন্যাস বর্তমান কালের বাংলাগানের অস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ এর পরিবর্তে উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ ছিল। এদেরকে বলা হত ধাতু। এই চারটি ধাতুই সব গানে থাকত এমন নয়। তবে উদগ্রাহ এবং ধ্রুব সব গানেই থাকত। এভাবে একটি ধাতু বর্জিত হলে তখন তাকে ত্রিধাতুক প্রবন্ধগীত বলা হত। দুইটি ধাতু বর্জিত হলে তাকে দ্বিধাতুক প্রবন্ধগীত বলা হত। বৌদ্ধ সহজিয়া গান মেলাপক বর্জিত। সেই হিসাবে এই গানগুলো ত্রিধাতুক প্রবন্ধগীতি।[১৩]

রাজ্যেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধগীত বিষয়ক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে প্রবন্ধগীতের ছয়টি অঙ্গ ছিল। যেমন- স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাটক ও তাল। এই ছয়টি অঙ্গের সবকয়টিই যে একটি গানেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা ছিল না। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে সাধারণত: দুটি অঙ্গ পরিলক্ষিত হয় পদ ও তাল। এ জন্য এই গানকে তারাবালী বলা হত।[১৪]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে বিভিন্ন রাগের নাম পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি গানই এক একটি রাগের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে। তবে এখানে তাল বিষয়ক কোন নির্দেশ নেই। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে যে তিনটি পদ পাওয়া যায়নি তার একটির অনুবাদে 'ইন্দ্রতাল' নামটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই 'ইন্দ্রতাল' নামটি থেকে অনুমান করা হয় যে, সম্ভবত এটি কোন রাগের নাম। তালের নাম নয়।[১৫]

এ প্রসঙ্গে সকুমার সেন মনে করেন, "ইহা রাগিণীর নাম না তালের নাম হইবে বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কি কোনো কোনো চর্যায় রাগিণীর সঙ্গে তালের নির্দেশ ছিল, যেমন- জয়দেবের পদাবলীতে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই।"[১৬]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে রাগ-রাগিণীর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি গান কোন রাগে গাওয়া হবে তার নিদের্শ রয়েছে। 'পটমঞ্জরী' রাগ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে রাগের সর্বাধিক ব্যবহার দেখা যায়। পটমঞ্জরী রাগে মোট **১২** টি গান রয়েছে, গীত সংখ্যা- **১**, ৬, ৭, ৯, **১১**, **১৭**, ২০, ২৯, ৩**১**, ৩৬, ৪৮। মল্লারী রাগে রয়েছে ৫টি গান, গীত সংখ্যা- ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯। গুঞ্জরী (গুর্জরী বা কাহ্নু-গুর্জরী) গান মোট ৪টি, গীত সংখ্যা- ৫, ২২, ৪**১**, ৪৭। কামোদ রাগেগান ৪টি, গীত সংখ্যাঃ- **১**৩, ২৭, ৩৭, ৪২। বরাড়ী (বলাড্ডী) মোট ৪টি গান, গীতসংখ্যা- ২**১**, ২৩, ২৮, ৩৪। ভৈরবী রাগে মোট ৪টি গান, গীত সংখ্যা- **১**২, **১**৬, **১**৯, ৩৮। গবড়া (গউড়া) রাগে গান মোট ৩টি, গীত সংখ্যা- ২, ৩, **১**৮। দেশাখ রাগে ২টি গান, গীত সংখ্যা- **১**০, ৩২। রামক্রী- ২টি গান, গীত সংখ্যা- ৫, ৫০। শবরী রাগে ২টি, গীত সংখ্যাঃ- ২৬, ৪৬। অরু দেবক্রী, ধানসী (ধানশ্রী), মালসী, মাসলী গবুড়া ও বঙ্গাল রাগে একটি করে গান রয়েছ।[১৭]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রাগ-রাগিণী বিষয়ক আলোচনায় ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য করেছেন,

> 'সঙ্গীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণে কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্রও দূর্লভ নয়। পরে কখন কিভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছে না। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া মালসী গুবড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্নু গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্তে। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশরাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। আর রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।"[১৮]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে পটহ বা ঢোল এবং একতারার নাম পাওয়া যায়। এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন বর্তমান কালের বাউল গানে ব্যাপক হারে রয়েছে। গীত, নৃত্য এবং বাদ্য সহযোগে বুদ্ধের কাহিনি পরিবেশিত হত যাকে বলা হয় বুদ্ধ নাটক। এই নাটকে যেসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হত তার বর্ণনা পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া গানে।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।

অণহা দান্ডী চাকি কিঅউ অবধূতি ॥

বাজাই আলো চাকি সহি হেরুঅ বীণা।

সূন তান্তি ধনি বিলসই করুণা।

(বীণা পাদ, **১**৭ নং পদ, রাগ- পটমঞ্জরী)

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে পটহ, মাদল, করণ্ড, কসাল, দুন্দুভি, বীনা, ডমরু, ডমরুলি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। এসকল বাদ্যযন্ত্র এ সময়ের জনপ্রিয় লোকসংগীতের একটি অঙ্গ বাউল গানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ছাড়াও মারফতি গানে এ সকল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৯]

পটহ: আনদ্ধ শ্রেনীর বাদ্যযন্ত্র। এটি দুই ধরণের দেশী এবং মার্গ। মার্গ পটহ দৈর্ঘ্যে আড়াই হাতের মত লম্বা এবং প্রস্থে ছয় ইঞ্চি পরিমান প্রশস্ত। মাঝের অংশটি স্থুল। ডান পাশের মুখ বাম পাশ অপেক্ষা বড়। দুই মুখেই চামড়ার আচ্ছাদন রয়েছে। এটি কোণ বা দণ্ড দিয়ে বাজানো হত। দেশী পটহ গঠনগত দিক থেকে মার্গ পটহের মতই তবে অপেক্ষাকৃত ছোট। এই যন্ত্রটি পদ্মাসনে বসে বাজানো হত।[২০]

মাদল: শব্দটি সংস্কৃত মর্দল শব্দের অপভ্রংশ থেকে এসেছে। এটি একটি গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র। এটির অবয়ব মূলত কাঠের তৈরি। এই বাদ্যযন্ত্রের দুই প্রান্ত চামড়ারর রজ্জু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এটির দুই পাশের পরিধি সমান। এটি সাধারণত কাঠের তৈরি। এই বাদ্যযন্ত্রের বাম প্রান্তে খরলি লাগানোর ব্যাবস্থা রয়েছে। মাদল মর্দল বা মুরজ নামেও পরিচিত।[২১]

দুন্দুভি: বৌদ্ধ সহজিয়া গানে বুহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র। প্রথমদিকে মাটির হাড়ি দিয়ে দুন্দুভি তৈরি করা হত। পরবর্তীকালে তামা, পিতল বা কাঠ দিয়েও এর অবয়ব তৈরি করা হয়েছে। কাঠ দিয়ে তৈরি করা হলেও এর ভিতরে কাঁসার পাত বসানো হত। এই বাদ্যযন্ত্রের মুখ পশুর চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গায়ে থাকে চামড়ার টানা। বাদ্যযন্ত্রটি হরিণের শিং বা শক্ত পাকানো দড়ি দিয়ে বাজানো হত। এটির আওয়াজ মেঘের গর্জনের মত।[২২]

ডমরু: একটি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। এটির নির্মাণ কৌশল বেশ সহজ। একখণ্ড কাঠের দুই প্রান্ত একটু স্ফীত হয় এবং ফাঁপা থাকে এবং মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত চাপা থাকে। দুই প্রান্ত চামড়াচ্ছাদিত এবং খোলের মাঝখানে এক খণ্ড সুতা বেধে দিয়ে একটি সিসার টুকরা ঝুলানো হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের **১১** সংখ্যক পদে ডমরু বাদ্যযন্ত্রটির নাম পাওয়া যায়।[২৩]

নাড়ি শক্তি দিট ধরিঅ খট্টে।

অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে৷৷[২৪]

বীণা: সপ্ততার বিশিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্র। এটি অতি প্রাচীন একটি বাদ্যযন্ত্র। তত বা তার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা অন্যতম প্রধান একটি বাদ্যযন্ত্র। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে লাউয়ের খোলের তৈরি বীণার ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন ফলকচিত্র গুলো বীণার প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে। বীণার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন: কিন্নরী বীণা, মহতী বীণা, ত্রিতন্ত্রী বীণা, সপ্ততন্ত্রী বীণা, কচ্ছপী বীণা, রূদ্রু বীণা, সুর-বাহার বীণা প্রভৃতি। এরকম ৫৬ রকমের বীণার নাম পাওয়া যায়। একটি একটি দুই বা আড়াই ইঞ্চি পরিধিযুক্ত বাঁশের দণ্ড দুইটি লাউয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় একটি স্ক্রুর সাহায্যে এবং নিচের অংশটি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা পরিমাপে গোল করে কাটা হয়। এই যন্ত্রে ষোল থেকে বাইশটি পর্দা সন্নিবেশিত থাকে এবং সাতটি তার ব্যবহার করা হয়। সাতটি বয়লায় এই তারগুলো সংযুক্ত করা হয়। লাউয়ের খোলের পরিধি এবং বাঁশের দণ্ডের পরিমাপ নির্দিষ্ট থাকে। লাউ দুটি বেশ গোলাকার হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে কাঠের তৈরি বীণার প্রচলন বেশি। বীণার সুর ধীর লয়ের এবং ক্ষণস্থায়ী। বাদন ভঙ্গিতে বেশ ঢিমে লয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। বীণা সুমিষ্ট, সুরেলা এবং গম্ভীর ধ্বনি উৎপন্নকারী একটি যন্ত্র।[২৫]

বাউল গানের কোনো সুনির্দিষ্ট স্বরলিপির প্রয়োগ নেই। সুরের ক্ষেত্রেও গায়কের স্বাধীনতা রয়েছে। বাউল গান সহজ সাধনার গান, এ গানের সুর সহজ ও সরল। ভাষাও সরল। বাউল গানের ভাষা এবং সুর বৈশিষ্ট্য সহজ সরল ও প্রাঞ্জল যা অতি সহজেই মানুষের মনে সঞ্চারিত হতে পারে। বাউল গান বাংলার বিশুদ্ধ লোকসংগীত। অঞ্চলভেদে বাউল গানের সুর, গীতিরীতি ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বাউল গানের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। জনসাধরণ শব্দ গান, ভাবগান, ফকিরি গান, ধুয়া গান প্রভৃতি নামে বাউল গানের স্বাদ আস্বাদন করে থাকে।[২৬]

যে বস্তু জীবনের করণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবনই তীর্থ-ধরম-পথ
এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদত
কেহ কেহ কয়
না করে অনুমান ভজন
করে না মুক্তির করণ
জীবনই সত্য নিরূপণ
দীন দুদ্দু কয়।[২৭]

বাউল গানে বস্তুবাদী চেতনার পরচয় পাওয়া যায়। আর এই বস্তু বলতে বোঝায় মানুষ এবং মানুষের জীবন ভিত্তিক সামগ্রিক বিষয়। বাউলদের কাছে অনুমান বা সংশয়ের কোন স্থান নেই। বাউল সাধনা মানব কেন্দ্রিক। মানুষের মধ্যে, দেহের মধ্যে, মানুষকে ভালবাসার মধ্যে এই বাউল মত বা সাধনার আদ্যপান্ত নিহিত রয়েছে। লালন সাঁই তাঁর বহু গানের মাধ্যমে এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সহজ মানুষ খুঁজে দেখনারে মন দিব্য জ্ঞানে
পাবিরে অমুল্য নিধি বর্তমানে।
কিংবা
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।[২৮]

বাউল গানের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ নিরসনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বাউল গানে মানব কেন্দ্রিক চেতনা চরমভাবে বিকশিত হয়েছে। বাউল গানের এই মানব কেন্দ্রিকতা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই গানকে সামাজিক জাগরণের গণসংগীতও বলা যায়।[২৯]

বাউল গান সাধারণত দুই ধরণের দৈন্য এবং প্রবর্ত। এর থেকেই রাগ দৈন্য এবং রাগ প্রবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এই রাগ শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ নয়। এই রাগ সাধন ভজনের রাগ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ন্যায় বাউল গানে রাগ শব্দটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখানে রাগ বলতে অভিমান এবং প্রেমের নিবিড়তাকে বোঝানো হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত কারো জন্য নিবেদিত প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির নামই রাগ। রাগ দৈন্যে এই ভাবের প্রকাশ ঘটে।

বাউল সম্প্রদায় সাধনপন্থাকে রাগের কারণ বলে অভিহিত করেছে।

আমার হয় না রে সে মনের মতন

আগে জানব কি সে রাগের কারণ।

বাউল গান সাধারণত পরিবেশনগত দিক থেকে দুই ধরণের হয়ে থাকে। আখড়া ভিত্তিক সাধন সংগীত এবং আখড়া বহির্ভূত অনুষ্ঠান ভিত্তিক সংগীত। সাধারণত আখড়ায় যে ধরণের গান পরিবেশিত হয় সেসব গানের সুর ও ঢং শান্ত এবং মৃদু লয়ের হয়ে থাকে। আখড়ার বাইরের গানগুলো হয়ে থাকে চড়া সুরের। বাউল গান কখনও দলগতভাবে আবার কষনও এককভাবে পরিবেশিত হয়। বাউল গানে সাধারণত প্রথম কলি বা অস্থায়ীতে একরকম সুর এবং অন্য কলিতে কিছুটা ভিন্ন রকমের সুর লক্ষ্য করা যায়। এই গানে অস্থায়ী এবং অন্তরাই মুখ্য। কোন কোন গানে সঞ্চারী থাকে। বাউল গানে কাহারবা, দাদরা, ঝুমুর, একতাল ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৩০]

একতারা, গোপীযন্ত্র এবং বাঁয়া একান্তভাবে বাউল গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। এছাড়াও দোতারা, খমক, মন্দিরা বা জুড়ি, নূপুর, বাঁশি, সারিন্দা, ডুগডুগি প্রভৃতি লোকবাদ্যগুলোও বাউল গানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একতারা: বাউল গানে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র। একতারা নামের সাথেই এই যন্ত্রের রূপ প্রকাশ পায়। এই যন্ত্রটিতে একটি মাত্র তার ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ততগোত্রের যন্ত্র। এটি একটি লোকবাদ্যযন্ত্র। একতারার নির্মাণ প্রক্রিয়া বেশ সরল। এই যন্ত্র তৈরি করতে একটি লাউ, একটি বাঁশ বা কাঠের দণ্ড, একটি তার, একটি সওয়ারী এবং একটি কাঠের বয়লার প্রয়োজন পড়ে। লাউয়ের উপরের অংশে থাকে চামড়ার ছাউনি। এই ছাউনির সাথে বাঁশ বা কাঠের দণ্ডটি আটকানো থাকে। দণ্ডটি খুব বেশি মোটা হয় না। দণ্ডটির মাথায় একটি কাঠের বয়লা লাগানো থাকে। বয়লা থেকে লাউয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একটি পিতল বা লোহার তার প্রসারিত করা হয়। লাউয়ের উপরের অংশ কেটে চামড়ার ছাউনি দেয়া হয়। ছাউনির উপরে হাড় বা কাঠের তৈরি একটি সওয়ারী যুক্ত থাকে। একতারা বাজানোর জন্য একটি মিজরাবের প্রয়োজন হয়। এটি ইস্পাতের তার দিয়ে তৈরি। এই মিজরাবটি ডান হাতের তর্জনী বা মধ্যমা আঙুলের মাপ নিয়ে বানানো হয়। এই দুই আঙুলের যেকোন একটি দিয়ে একতারা বাজানো হয়ে থাকে। তারে আঘাত করার মাধ্যমে সুরের ঝংকার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় একটি সুমিষ্ট ছন্দেরও। একতারাকে বস-মাধুরীও বলা হয়ে থাকে।[২৮]

গোপীযন্ত্র: ততগোত্রীয় লোকবাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রটি চিমটে প্রকৃতির একতারার মত। দুই ফুটের মত লম্বা একটি বাঁশ দণ্ড নিয়ে উপরের দিকে না ফেঁড়েতার উপরে দুই ভাগ করা হয়। ঐ অংশটুকু চেঁছে মসৃণ করে নেওয়া হয়। একটি লম্বা লাউয়ের খোল কেটে নেওয়া হয় এবং খোলের নিচের অংশটি অক্ষত থাকে। খোলের উপরের দুই পাশে বাঁশের অংশ দুটিকে সংযুক্ত করা হয়। খোলের নিচের অংশ থেকে ভিতর দিয়ে একটি পিতল বা লোহার তার বাঁশের উপরের প্রান্তে বসানো কানের সাথে সংযুক্ত করা হয়। কানটি ঘুরিয়ে সুর

চড়ানো বা নামানো হয়। বাঁশ দণ্ড দুটির মধ্যে একটি ডান হাতে ধরে তর্জনী দ্বারা আঘাত করা হলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই যন্ত্রে একটি মাত্র স্বরই পাওয়া যায়।[২৯]

বাঁয়া: একটি অত্যন্ত পরিচিত বাদ্যযন্ত্র। তবলা এবং বাঁয়া যেকোন ধরণের সংগীতের সঙ্গে সঙ্গত করা হয়। তবে বাউল গানে ব্যবহৃত বাঁয়া সাধারণ অর্থে বাঁয়া বলতে আমরা যেটা চিনি তার থেকে কিছুটা ভিন্ন রকম। এটি আকারে অনেকটা ছোট এবং সাধরণত মাটির তৈরি হয়ে থাকে।বাঁয়া গোপীযন্ত্রের সাথে সঙ্গত করা হয়।[৩০]

দোতারা: তত বা তার জাতীয় একটি লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি কাঠের তৈরি। প্রায় আড়াই ফুট দীর্ঘ এবং আধা ফুট পরিমাণ প্রশস্ত একটি কাঠ খোদাই করে দোতারা বানানো হয়ে থাকে। যন্ত্রটির নিচের অংশ খোলের মত। উপরের অংশটি দণ্ডাকৃতির। খোল এবং দণ্ডের ভিতরের অংশটি ফাঁপা হয়। খোলের উপরের অংশে চামড়ার ছাউনি লাগানো থাকে। দণ্ডের বুকের অংশ পটরী নামে পরিচিত। এই অংশে একটি ইস্পাতের পাত স্ক্রুর সাহায্যে দণ্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ছাউনির বুকের অংশে একটি সওয়ারী স্থাপন করা হয়। সওয়ারী হাড় বা কাঠের তৈরি হয়ে থাকে। পটরীর উপরের অংশে একটি তারগাহন লাগানো থাকে। এই তারগাহনের উপরে চারটি বয়লা লাগানো থাকে। দোতারার প্রথম তারটি লোহা নির্মিত। প্রথম তারটির সুর বাঁধা হয় মধ্য সপ্তকের মধ্যস্বরে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তার দুটি নাইলন বা মুগা সুতার তৈরি। এই দুই তারের সুর বাঁধা হয় সপ্তকের ষড়জে। চতুর্থ তারটিকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধা হয়। দোতারার পঞ্চম তারটিকে বলা হয় চিকারি। দোতারা জরয়া বা গুটির সাহায্যে বাজানো হয়। এই বাদ্যযন্ত্রের সুর অত্যন্ত শ্রুতি মধুর হয়ে থাকে।[৩১]

খমক: এক প্রকার লোকবাদ্য। এই বাদ্যযন্ত্রের অপর নাম আনন্দলহরী। একটি ক্ষুদ্রাকার ঢোলের একপাশে চামড়ার ছাউনি থাকে। অপর পাশ থাকে উন্মুক্ত। ছাউনির মধ্যভাগে একটি ছিদ্র করে একটি কাঠের টুকরার সাথে কিছুটা তাঁত বা একপ্রকার সুতা বিশেষের একটি প্রান্তসংযুক্ত করা হয়। অপর প্রান্তটি অনাচ্ছাদিত অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। লকড়ি বা কাঠের খোলের অংশটি বাম কক্ষে চেপে ধরা হয় এবং খোলা প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা সুতাটি বাম হাতে টেনে ধরে ডান হাত দিয়ে একটি কাঠের অথবা নারকেলের মালার তৈরি একটি টুকরা দিয়ে তাতে আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। বাম হাতে তাঁতের টান শক্ত বা ঢিলা করে স্বরের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন ঘটানো হয়। বাউল গানে এই বাদ্যযন্ত্রটির বুহুল ব্যবহার রয়েছে। এই যন্ত্রটি গুবগুবি নামেও পরচিত।[৩২]

মন্দিরা: এক ধরণের ঘন বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরা কাঁসা বা পিতল নির্মিত। এটি দেখতে দুটি ছোট বাটির মত। বাটির উপরের অংশে ঠিক মাঝ বরাবর ছোট ছিদ্র থাকে। যার মধ্য দিয়ে একটি রজ্জু প্রবেশ করানো হয়। দুই হাতের আঙুলের সাথে রজ্জু পেঁচিয়ে নিয়ে বাটি দুটিতে পরস্পর আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয়। বাউল গান সহ বিভিন্ন লোকগানেও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৩]

বাঁশি: শুষির গোত্রের একটি বাদ্যযন্ত্র। প্রথমে এটি লোকবাদ্য হিসেবে এটির প্রচলন ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে রাগ সংগীতেও ব্যবহার শুরুহয়। সাধারণত এই বাদ্যযন্ত্রটি বাঁশ দ্বারা নির্মাণ করা হয় তাই এটির নাম বাঁশি হয়েছে। বাঁশি খাড়াভাবে ধরে ওপরের প্রান্তে বাঁকা করে কাটা হুইসেলের মত একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রে মুখের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে বাঁশি বাজানো হয়।আবার আড়াআড়িভাবে ধরে নিচের আবদ্ধ প্রান্তে যে ছিদ্র থকে সাখানে ফুঁ দিয়েও বাজানো হয়। বাউল গানে সাধারণত আঁড় বাঁশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাঁশির গায়ে থাকে স্বর ছিদ্র। এই স্বর ছিদ্রে আঙুল চালনা করে বাঁশি বাজানো হয়ে থাকে। বাঁশিতে আট থেকে নয়টি পর্যন্ত ছিদ্র

দেখা যায়। আবার চারটি ছিদ্রযুক্ত আঁড় বাঁশিও রয়েছে। বাঁশির ধ্বনি অত্যন্ত সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক। বাঁশি মুরলী, বেনু, বংশী নামেও পরিচিত।[৩৪]

সারিন্দা: একটি তত বা তার গোত্রের বাদ্যযন্ত্র। বাংলা লোকসংগীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র হল সারিন্দা। এটি সাধারণত দুই ফুটের মত দীর্ঘ হয়ে থাকে। একটি কাঠের খণ্ড কেটে এবং নিচের অংশটি খোদাই করে যন্ত্রটির মূল কাঠামো তথা ধ্বনিকুম্ভ তৈরি করা হয়। মূলত ধ্বনিকুম্ভের সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অংশে চামড়ার আচ্ছাদন না লাগিয়ে এর সরু অংশে ক্ষুদ্রাকারে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়ে থাকে। আর এই ছাউনির উপরই বসানো হয় সওয়ারী। সারিন্দায় প্রধানত তিনটি তার ব্যবহারক করা হয়ে থাকে। সারিন্দার মাথার অংশটিতে বিভিন্ন ধরণের কারু কাজ করা হয়। সাধারণত জীবজন্তু বা পাখির আকৃতি খোদাই করে কারুকার্য করা হয়ে থাকে। মাথার অংশে তিনটি কাঠের বয়লা বা কান লাগানো থাকে। সওয়ারীর উপর থেকে তিনটি তারের মাধ্যমে সারিন্দার একদম শেষ প্রান্তে আবদ্ধ অংশটিতে আটকানো হয়ে থাকে। এই তার গুলো মূলত চামড়ার তৈরি। বয়লা বা কান ঘুরিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সুরকে চড়ানো বা নামানো হয়ে থাকে। এখানে কোন প্রকার পর্দা থাকে না। সারিন্দা ধনুক আকৃতির একপ্রকার ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয়ে থাকে। ছড়টি সাধারণত ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে বানানো হয়। সারিন্দায় পটরির উপর বাম হাতের আঙুল তারের উপরে রেখে তারটি টিপে ধরে ডান হাতে ছড় টেনে সুর তোলা হয়ে থাকে। ঢাকা এবং নরসিংদী অঞ্চলে সারিন্দার ব্যবহার ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায়। এক সময় অন্যান্য অঞ্চলেও এই বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। সারিন্দা বাংলাদেশের লোকসংগীত এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের একটি বিশেষ অংশ। প্রাচীনকাল থেকেই এই বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত বাউল গান, কবিগান, মুর্শিদি গান, মারফতি গানে এই বাদ্যযন্ত্র প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বাজানো হয়ে থাকে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে এই বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।[৩৫]

ডুগডুগি: এক ধরণের আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। এটি মূলত লোকবাদ্য হিসেবেই পরিচিত। এক খণ্ড কাঠের টুকরার দুই পাশ স্ফীত এবং ফাঁপা হয়ে থাকে এবং মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত চাপা হয়। দুই প্রান্তে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়ে থাকে। খোলের ঠিক মাঝ বরাবর একটি সুতা বেধে তার সাথে এক টুকরা সীসা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। একটি হাতের সাহায্যে খোলের মাঝের অংশটি ধরে নাড়া দেওয়া হলে সুতায় ঝোলানো সীসা চামড়ার ছাউনির অংশে আঘাত করে। যার মাধ্যমে একপ্রকার ধ্বনির উৎপত্তি ঘটে। বাউল গানে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই যন্ত্রের প্রাচীন নাম ডমরু। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ডমরু বাদ্যযন্ত্রটির প্রচন ছিল।[৩৬]

নৃত্য ও কথকতা বাউল গানের প্রথাগত অঙ্গ বৈশিষ্ট্য। পরিবেশনকারীর সাজসজ্জা, নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি, স্বরক্ষেপণ, গীতরীতি, লয় এবং তাল ফেরতার বৈশিষ্ট্যে বাউল গান শুধু শ্রাব্য বিষয় না থেকে দৃশ্যনাট্যও হয়ে ওঠে। বাউল গানের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। বাউল সাধকগণের গানে রয়েছে সমাজ, সমাজমন, মানুষ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সাম্যতা, মানবপ্রেম, মানবতা, মানতাবাদ। সর্বোপরি রয়েছে মানব ধর্ম। বৌদ্ধ সহজিয়া গান বাংলা গানের প্রাচীন নিদর্শন। বাউল গান বাংলা লোকসংগীতের প্রাচীন নিদর্শন। বৌদ্ধ সহজিয়া গান যেমন সাধনার গান। বাউল গানও তেমনি সাধন তত্ত্বের গান। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ব্যবহৃত ভাষা আলোআঁধারির ভাষা। বাউল গানের ভাষা সহজ ও সরল। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে সুনির্দিষ্ট রাগের ব্যবহার রয়েছে। বাউল গানের ক্ষেত্রে তেমন কোন নিয়ম নেই। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে প্রাচীন কিছু বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বাউল গানেও প্রাচীন লোক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাউল গানের মুলে রয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়া গান।

তথ্য সূত্রঃ

১. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*,স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ১৮

২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫০

৩. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ২৭

৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭,২৮

৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.৫৫

৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ২৯

৯. ড. নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৯, ৯০

১০. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ২৯,৩০

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩১

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৪,১৫

১৪. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ৩২

১৫. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬

১৬. উদ্ধৃত,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭(৭ম সংস্করণ), পৃ. ৩৪

১৮. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪,৩৫

১৯. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬-১৮

২০. মোবারক হসেন খান, *বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২২. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৮৮

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪

২৬. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, প্রথম খণ্ড , একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬৭

২৭. সুমন শিকদার (সম্পাদিত), *বাউল ভাবনা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. প্রসঙ্গ কথা-৮

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. প্রসঙ্গ কথা-৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. প্রসঙ্গ কথা-৮

৩০. বাংলাপিডিয়া

৩১. মোবারক হসেন খান, *বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৭

৩২. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৯১

৩৩. প্রাগুক্ত,২০০৮, পৃ. ৫১৭

৩৪. মোবারক হসেন খান, *বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৯

৩৫. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫,২৬

৩৬. প্রাগুক্ত, ১৯৮৫,পৃ. ৪৩৬

৩৭. প্রাগুক্ত, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫৭, ৩৫৮

৩৮. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫১০,৫১১

৩৯. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩০,২৩১

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানে রচয়িতাদের অবদান

চতুর্থঅধ্যায়
বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল গানে রচয়িতাদের অবদান

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে রচয়িতাদের অবদান অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনা করেছেন। সাধারণত বজ্রযানী ও সহজযানী আচার্যগণই সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। তিব্বত এবং ভারতীয় ইতিহাসে তাঁরা চৌরাশি সিদ্ধা নামে অভিহিত হয়েছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচয়িতাগণ পূর্ব ভারত এবং নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া কেউ কেউপূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, রাঢ়, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম বা কামরূপেরও অধিবাসী ছিলেন। সিদ্ধাচার্যগণ তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। যেমনঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বণিক এমনকি কেউ কেউ সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী থেকেও এসেছেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন রাজবংশজাত। তাঁরা ধর্ম, শাস্ত্র ও বিধান মানতেন না বলে তাঁদেরকে নাস্তিকও বলা হত। তাঁদের কাছে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করাই মূখ্য বিষয় ছিল।[১]

মূলত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রবোধ চন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত গানগুলোই সর্বজন গ্রাহ্য। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচয়িতাগণের মধ্যে লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুপা, চাটিলপা, ভুসুকুপা, গুণ্ডরীপা, কাহ্নপা, কম্বলাম্বরপা, শান্তিপা, ডোম্বীপা, মহীধরপা, বাণীপা, শবরপা, সরহপা, আর্যাদেবপা, ঢেণঢণপা, ভাদেপা, দারিকপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, ধামপা, লাড়ীডোম্বীপা, জয়নন্দীপা, তন্ত্রীপা অন্যতম। তাঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রথম গানটি রচনা করেন লুইপা। গানের সংখ্যার ভিত্তিতে কৃষ্ণাচার্যপা তথা কাহ্নপা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তেরটি গান রচনা করেছেন। এরপরই ভুসুকুপার অবস্থান তিনি চারটি গান রচনা করেন এবং কুক্কুরীপা তিনটি গান রচনা করেন।[২]

লুইপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচয়িতাদের মধ্যে আদি সিদ্ধাচার্য হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ১ এবং ২৯ সংখ্যক পদ দুটি তিনি রচনা করেছেন। ধারণা করা হয় লুইপা বাঙালি কবি।[৩] তাঁর সম্পর্কেড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহবলেন, “তারানাথেরমতে লুই বাংলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। তিনি প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ বা লেখক ছিলেন। লুইপার জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ সাল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম ‘অভিসময়বিভঙ্গ’।”[৪]

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই।

আইস সংবোহে কোপতিআই ॥

লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।

তিঅ-ধাএ বিলসই উহ ন ঠাণা ॥

জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জানি।

সো কইসে আগম বেত্রঁ বখাণী॥

(লুইপা, ২৯ নং পদ, রাগ-পটমঞ্জরী)

সিদ্ধাচার্য কাহ্নপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে পদ রচনার ভিত্তিতে যিনি প্রাধান্য পেয়েছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ সংখ্যক পদ সমূহ রচনা করেছেন। চারটি গানে (৭, ১২, ৪০, ৪৫) ভণিতায় আছে 'ভণই কাহ্ন (কাহ্নু)'। ১৮ সংখ্যক গানে রয়েছে 'কাহ্নে গাই'। বাকি সব স্থানে 'কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নিল, কাহ্নিলা' প্রথম পুরুষ রূপে ব্যক্ত রয়েছেন। তিনি কৃষ্ণপাদ,কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ, কৃষ্ণাচার্যসুন্দর, কৃষ্ণাচার্যচরণ প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন।[৫] ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ধারণা করেন খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে কাহ্নপার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর বাড়ি উড়িষ্যায় ছিল এবং তিনি সোমপুর বিহারে বসবাস করতেন। তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর জীবৎকাল ছিল ৮৪০ পর্যন্ত। বর্ণে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তিনি ছিলেন সিদ্ধ ও ভিক্ষু। পণ্ডিত-ভিক্ষু নামেও খ্যাত ছিলেন তিনি। তিনি অপভ্রংশ ভাষায়ও দোহাকোষ রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুগত বিবেচনায় তিনি সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের যোগী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[৬]

ড. সুকুমার সেনের মতে, "কাহ্নর চর্যাগীতির রচনারীতিতে অস্পষ্টতা নাই। কয়েকটি প্রেমলীলা-রূপকমণ্ডিত চর্যাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন বলিয়া লইতে পারি।"[৭]

মণ তরুপাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।

আশা বহল পাতহ বাহা ॥

বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিঝঅ।

কাহ্ন ভণই তরুপুন ন উইজঅ ॥

বাটই সো তরু সুভাসুভ পাণী ।

ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥

(কাহ্নপা, ৪৫ নং পদ, রাগ- মল্লারী)

ভুসুকুপা রচনা করেন আটটি পদ। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে তাঁর অবদানও অসামান্য। তিনি ছিলেন সহজানন্দের সাধক বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় সংখ্যার বিবেচনায় তিনি দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ধারণা করা হয় তিনি অশ্বারোহী যুদ্ধ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন রাউত। ভুসুকু নিজেকে এবং তাঁর শীষ্যদেরকে যোগী বলেছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ এবং ৪৯ সংখ্যক পদ ভুসুকু পা রচনা করেছেন।[৮] ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ধারণা করেন ভুসুকু পা সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে ভুসুকু পা অষ্টম শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন তাঁর সময় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।

(ভুসুকুপা, ৪৯ নং পদ, রাগ- মল্লারী)

ভুসুকুর এই উক্তিটিকে আশ্রয় করে অনেকেই অনুমান করেন তিনি বাঙালি। ধারণা করা হয় প্রথমে তিনি অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। পরবর্তীতে ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন। অনেকে ভুসুকু পা এবং আচার্য শান্তিদেবকে অভিন্ন মনে করেন আচার্য শান্তিদেব। তবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।[৯]

সরহপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানের রচয়িতাগণের মধ্যে অন্যতম একজন রচয়িতা। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় বিশেষ অব্দান রেখেছেন। তিনি ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানে ধ্যান-ধারণা ও যোগের নির্দেশ রয়েছে। সাধনমার্গের উপদেশ রয়েছে তাঁর রচনায়। ধারণা করা হয় সিদ্ধাচার্য সরহপা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। সরহ একটি অত্যন্ত বিরল নাম। প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি জৈন গল্পে সরহ একটি ব্যাধের নাম। নামটির মূল শরভ অথবা সরঘ হতে পারে।[১০]

তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। সম্ভবত তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গ-কামরূপের রাজ্ঞী দেশ। কামরূপের রাজা রত্নপাল তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচিত দোহাকোষের ভাষা ছিল অপভ্রংশ। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সরহ পা রচিত পদাবলীর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী।[১১]

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অন্তে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসা জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥

(সরহপা, ২২ নং পদ, রাগ- গুঞ্জরী)

কুক্কুরীপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে অন্যতম একটি নাম। বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ২, ২০ এবং ৪৮ সংখ্যক পদ তিনি রচনা করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই মত পোষণ করেন যে কুক্কুরী পা বাংলাদেশী। তিনি ছিলেন ইন্দ্রভুতির একজন অন্যতম গুরু। ধারণা করা হয় তিনি অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, রাজা দেবপালের শাসনামলে কুক্কুরী পা বর্তমান ছিলেন। তিনি কপিলাবস্তুতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি অন্যতম একজন সিদ্ধা ছিলেন।[১২]

হাউঁ নিরাসী খমণ ভতারে।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি ॥
পহিল বিআণ মোর বাসনয়ূড়।
নাড়ি বিআরেন্তে সেব বায়ূড়া ॥
জান যৌবন মোর ভইলেসি পূরা।
মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥

(কুক্কুরীপা, ২০ নং পদ, রাগ- পটমঞ্জরী)

শান্তিপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি ১৫ এবং ২৬ সংখ্যক পদ রচনা করেন। তিনি ছিলেন বিক্রমশীলা বিহারের দ্বার পণ্ডিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় তাঁর ভাষা প্রাচীন মৈথিলী। ধারণা করা হয় শান্তি রত্নাকরের সংক্ষিপ্ত নাম শান্তি পা।[১৩]

তুলা ধুণি ধুণি আসুঁ রে আসুঁ।

আসুঁ ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥

তউ যে হেরুঅ ণ পাবিঅই।

সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥

তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ।

পুন লইআঁ অপণা চটারিউ ॥

(শান্তিপা, ২৬ নং পদ, রাগ- শীবরী)

শবরপা বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। ধারণা করা হয় তিনি অবাঙালি কবি ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধারণা করেন, শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ধারণা করেছেন, শবর পা বিক্রমশীলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং অন্যতম একজন সিদ্ধা। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ড. সুকুমার সেন এই মত পোষণ করেছেন যে, শবর পা হলেন লুই পার গুরু।[১৪]

উষ্ণা উষ্ণা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।

মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।

ণিঅঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥

ণাণা তরুবর মৌলিল ওে গঅণত লাগেলী ডালী।

একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥

তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।

সবরো ভুজঙ্গ ণনরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহ কাপুর খাই।

সুন নিরামণী কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥

(শবর পা, ২৮ নং পদ, রাগ- বলাড্ডি)

আজদেবপা বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় অবদান রেখেছেন। তিনি **৩১** সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি মহাচার্য, কাণেরিগীতিকা এবং চর্যামেলায়নপ্রদীপ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পদে চারটি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শব্দ চারটি হল- করুণা, ণিরালে, চিঅ এবং সুণ। তিনি সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তাঁর মূল নাম আর্যদেব।[১৫]

জহি মণ ইন্দিঅবণ হো ণা।

ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥

অকট করুণা-ডমরুলিবাজঅ।

আজদেব ণিরালে রাজই ॥

(আর্যদেবপা, **৩১** নং পদ, রাগ- পটমঞ্জরী)

ভাদেপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে ৩৫ সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সহজানন্দদৃষ্টি গীতিকার তিব্বতী অনুবাদ রয়েছে। ধারণা করা হয় এটি চর্যাগীতি অথবা চর্যাগীতিকোষ। এখানে প্রাপ্ত পদটিকে সহজানন্দদৃষ্টি বিষয়ক বলা হয়ে থাকে। এই পদটিতে তান্ত্রিকতার প্রয়োগ নেই।[১৬]

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁসু মোহে।

এঁবে মই বুঝিল সদগুরুবোহেঁ ॥

এঁবে চিঅরাগ মকুঁ ণঠা।

গণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥

(ভাদেপা, ৩৫ নং পদ, রাগ- মল্লারী)

ডোম্বীপা বৌদ্ধ সহজিয়া গানে **১৪** সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। তিনি ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি ছিলেন বিরুপা এর শিষ্য। তিনি চুরাশি সিদ্ধার একজন। তিনি বর্ণে ছিলেন ক্ষত্রিয়। মগধের অধিবাসী ছিলেন। রাহুল সংকত্যায়নের মতে তার জীবৎকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকাল পর্যন্ত।[১৭]

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই।

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥

বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।

সদগুরু পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণুউরা ॥

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।

গঅণ-দুখোলেঁ সিংচহুঁ পাণী ন পইসই সান্ধি ॥

(ডোম্বীপা, **১৪** নং পদ, রাগ- ধনসী)

বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় সিদ্ধাচার্যগণের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা তাঁদের সাধনা ও মেধার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রচনা করেছেন এই গানগুলো। বিরুপা, দারিক পা, কম্বলাম্বর পা, কঙ্কণ পা, মহীধর পা, ধাম পা, জয়নন্দী পা, বাণী পা, গুণ্ডরী পা, ঢেণঢণ পা প্রমুখ রচয়িতাগণ বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনায় অসামন্য অবদান রেখেছেন।

সিদ্ধাচার্যগণ সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> তিব্বতী ঐতিহ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধাদের পূর্বজীবনের বর্ণ বা বৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, আর্যদেব, কঙ্কণ, ডোম্বী ও দারিক রাজা ছিলেন, কম্বলাম্বর ও ভুসুকু ছিলেন রাজপুত্র। জয়নন্দী ছিলেন রাজমন্ত্রী, লুই পাদ ছিলেন রাজসভার লেখক। জয়নন্দী, ধাম ও সরহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুক্কুরিও সম্ভবত তাই। কাহ্ন সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন, শবরি ছিলেন ব্যাধ। ডোম্বী বিয়ে করেছিলেন ডোমকন্যা, কুক্কুরীর সহচরী পূর্বজন্মে ছিলেন কুক্কুরী। অনাচারের দায়ে বিহার থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন বিরুআ, বিহারের দ্বারপণ্ডিত হয়ে বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন শান্তি। সিদ্ধাদের নামের মত এই পরচিতির মধ্যেও যেমন অনার্যসংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পূর্বজীবনের বর্ণগত পরিচয়দানের প্রচেষ্টা থেকে বঝা যায় যে, আর্যত্বের মহিমা তখন কত প্রবল ছিল।”[১৮]

বৌদ্ধ সহজিয়া গানে রচয়িতাগণের অবদান অসামান্য। বৌদ্ধ সহজিয়া গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রগণ্য। তাঁরা তাঁদের গান এবং সাধনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারা বৌদ্ধ সহজিয়া গান। বৌদ্ধ সহজিয়া গান বাংলা গানের ধারার যেমন শেকড়ে রয়েছে তেমনি বাংলাগানের ধারাকে করেছে সমৃদ্ধশালী। আর এই গান রচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন সহজিয়া সাধকগণ তথা সিদ্ধাচার্যগণ।

বাউল গানের ক্ষেত্রেও বাউল সাধকগণের অবদান অসামান্য। বর্তমানে বাউল গান যে এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার নেপথ্যে রয়েছে বাউল গানের রচয়িতাগণ। বাউল সাধনা ও দর্শন একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। বাউল সাধকগণ তাঁদের সাধনার বানী গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং জনমানসে প্রচার করার প্রচেষ্টা করেছেন।

লালন শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল কবি। মানবতাবাদের প্রবক্তা মধ্যযুগীয় কূপমন্ডূকতার উর্ধ্বে উঠে আসেন বাংলার মহান সাধক-কবি লালন শাহ। তাঁর গানের মর্মবাণীই হল মানুষে মানুষে কোন জাতি বিভেদ নেই। তার গানের মূল বিষয় মানবধর্ম। লালন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জাতি বিভেদের বিরোধিতা করেছেন।তিনি তাঁর সাধনার বানী গানের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। তাঁর গানের মূলভাব হল হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান এই ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্যকে দূর করে একটি ধর্ম মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। তিনি এমন একটি সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে ধনী ও দরিদ্রে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সাম্য ও মৈত্রীর একটি শুদ্ধ সমাজ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। লালনের গান কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে লালনের গানের মুলভাব প্রচার করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর গানে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সূফীবাদের একটি সংমিশ্রণ ঘটেছে। নাথ-যোগী, মন্ত্র, গুরুবাদী এবং ভক্তিবাদী সমাজ মানসেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।লালন চেতনায় মিশে রয়েছে মানব ধর্ম। তাঁর মনের লালিত বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর মানবকুলের একটিই ধর্ম থাকবে। সেটি মানব ধর্ম। লালন তাঁর গানের এসব বাণীতে জাত ও ধর্ম বিচারের প্রশ্নকে কখনওই সমর্থন করেননি।[১৯]

তাঁর রচিত একটি জনপ্রিয় গান সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। গানটি অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই জাতি ভেদের প্রশ্ন নিয়ে তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গান অধিকাংশই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয় গানের মধ্যে জাতি বৈষম্য বিরোধী আরও দুটি গান যথাক্রমে গান 'জাত গেল জাত গেল বলে একই আজব কারখানা' এবং 'এমন মানব সমাজ করে গো সৃজন হবে।'

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কী রূপ
আমি দেখলাম না দুই নজরে।
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ॥
কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কার রে
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ॥
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ, বামণি চিনে কিসে রে
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ॥
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালন সে জেতের ফাতা ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ॥[২০]

জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি
সবই দেখি তা না না না ॥
আসবার কালে কি জাত ছিলে
এসে তুমি কি জাত নিলে
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা ভেবে বলো না ॥
ব্রাহ্মণ চন্ডাল চামার মুচি
এক জলে সব হয় গো শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাউকে ছাড়বে না ॥
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেল না ॥[২১]

যেদিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে
এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে ॥
শুনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে নাহি দেবে ॥
আমির-ফকির হয়ে একঠাই
সবার পাওনা পাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রে হায়
ভবে কেহ নাহি পাবে ॥
ধর্ম, কুল, গোত্র, জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে ॥[২২]

লালনের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। ধারণা করা হয় লালন ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড উপজেলার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কোনো কোনো গবেষকদের মতে, লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। লালনের প্রকৃত নাম ললিত নারায়ণ কর। পিতা মাধবচন্দ্র কর ও মাতা পদ্মাবতী। জন্মগতভাবে তিনি হিন্দু এবং পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও তিনি মূলত মানব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। লালন সাঁই তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ তথা নবদ্বীপে যাত্রা করেছিলেন এবং যাওয়া অথবা ফেরার পথে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন,

> "এদিকে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ ভাসতে ভাসতে কুলে এসে ভেড়ে। একজন তন্তুবায় মুসলমান রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যান। এই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন রোগমুক্ত হন। কিন্তু বসন্ত রোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়। আরোগ্য লাভের পর লালন ভাঁড়ারায় নিজ গৃহে ফিরে যান। তাঁর আকস্মিক ও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে তাঁর মা ও স্ত্রী যুগপৎ আনন্দ-বেদনা-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু গ্রামের সমাজপতি ও আত্মীয়-স্বজন মুসলমানের গৃহে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে এবং পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্নের পর তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাজ ও সজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে চিরতওে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনায়সমাজ-সংস্কার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্ম সম্পর্কে লালন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়। সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কূল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র অনীহা ও অসন্তোষ ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার এক্তা প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমেয়।"[২৩]

লালনের সাধনা ও সংগীত জীবনে সিরাজ সাঁই নামক একজন ব্যক্তির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। সিরাজ সাঁই লালনের গুরু ছিলেন। সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে এসে লালন জগৎ সংসার ও জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পান। সিরাজ সাঁই ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী একজন বাউল সাধক। যার জ্ঞানের প্রভাবে লালনের জীবনকে আলোকিত করেছিল। লালনের জীবনে সিরাজ সাঁইয়ের প্রভাব সম্পর্কে আবুল আহসান চৌধুরী এভাবে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন।

> "লালন সাঁই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা লাভের পূর্বে হয়তোবা তাঁর ধর্মান্তর ঘটে থাকতে পারে। এর পিছনে স্বজন-স্বজাতির হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যানের বেদনা, হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নির্মম অভিজ্ঞতাএবং হিন্দু সমাজে প্রত্যাবরতনের সম্ভাবনাহীনতা প্রধানত কাজ করেছিল। বাউল মতবাদে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন।"[২৪]

মানুষতত্ত্ব, সহজ মানুষ ভজনতত্ত্ব এক কথায় মানুষ রতন তত্ত্ব লালনের গানের মূল বিষয়। বাউল সাধনার মূল লক্ষ্য মানবতত্ত্ব। সহজিয়া জীবনের সাধক হল বাউল। বাউল সাধকগণ উদারনৈতিক চেতনার অধিকারী। তাই বাউল সাধনার এই মুক্তাঙ্গনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এসে মিলিত হতে পেরেছে। বাউল সাধনা দেহবাদী এবং গুরুমুখী। বাউল গুহ্যরহস্যের উত্তরাধিকারী গুরুশিষ্য পরম্পরায়। এই বাউল ধর্ম ও সাধনায় লালন শ্রেষ্ঠ সাধকের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাদর্শের প্রচার ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট গানের মধ্য দিয়ে। তিনি ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন। বাউল সাধনা ও গানে লালন সাঁই একটি অনবদ্য নাম। বাউল গান রচনায় তিনি অভাবনীয় অবদান রেখেছেন।

পাঞ্জু শাহ বাউল গানের ইতিহাসে অন্যতম একটি নাম। তিনি ছিলেন মরমি কবি ও আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর জীবনে সুফি ও বাউল মতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গানে কীর্তন, গাজীর গান, ধুয়া, জারি ও ভাব সঙ্গীতের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সৃষ্ট গানগুলো বাউল তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাউল সাধক পাঞ্জু শাহ ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ) বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাদেমালী খোন্দকার এবং মাতার নাম জোহরা বেগম। তাঁর পিতা ছিলেন গোঁড়া মুসলিম। পাঞ্জু শাহর পূর্ব পুরুষগণ এলাকার জমিদার ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে দরিদ্রদশায় পতিত হন। গোমস্তার ষড়যন্ত্রে পাঞ্জু শাহর পিতা জমিদারী হারিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড থানার হরিশপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন।পাঞ্জু শাহর দীক্ষা গুরু ছিলেন হিরাজতুল্লাহ।

এ প্রসঙ্গে খোন্দকার রিয়াজুল হক লিখেছেন,

> "পাঞ্জু শাহের বয়স ত্রিশ বছর। তাঁর পিতা তখন ইহজগতে আর নেই। স্বাধীনভাবে পাঞ্জু সে সময় এ জগৎ ও জগতের কাজে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এদিকে গুরুর সন্ধানও মিলেছে। কাজেই বিলম্ব না করে তিনি হিরাজতল্লাহর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তত্ত্বজিজ্ঞাসা মিটাতে সচেষ্ট হলেন। সূফী মরমিয়া সাধন পদ্ধতি অনুসারে পাঞ্জু শাহের এই দীক্ষা গ্রহণ সুসম্পন্ন হল। দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় তাঁর ধর্মীয়-শিক্ষা জীবন। তদীয় গুরু শিক্ষাদান সম্পর্কে পাঞ্জু শাহ বলেন-
>
> এই পশুর কত মতো পড়া দিয়া দিয়া।
>
> বুলি ধরাইতে চান মেহের করিয়া ॥"[২৫]

পাঞ্জু শাহ সার্বজনীন মানবতাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনিও ছিলেন গুরুবাদী সাধক। তাঁর দীক্ষা গুরু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

হিরাজতুল্লাহ খোন্দকার তিনার কদম সার,

করিলে পাইব পারোয়ার।

তিনি তো আল্লার অলী, হিরুচাঁদগানে বলি,

তা বিনে না দেখি কিনার ॥[২৬]

পাঞ্জু শাহ ছিলেন অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি বিরোধী মানবতাবাদী একজন সাধক।

পাঞ্জু শাহ গেয়েছেন-

কুল বলে মুই ভুলে রলাম,

ভোজের বাজি করে গেলাম।[২৭]

উক্ত চরণ দুটিতে মানবতাবাদী মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। এখানে হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদাভেদ নেই।

এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখেছেন, "হিন্দু আধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে যোগ হয়েছে মুসলমান আধ্যাত্মসাধনার। গঙ্গা যমুনার মত রাম-রহিমের মরমিয়া সাধনা একসঙ্গে বয়ে চলেছে।" পাঞ্জু শাহ ছিলেন এই সাধনারই একজন অনুসারী।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জু শাহ সৃষ্ট গান সমূহে তৎকালীন ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং কৃষিজ বিভিন্ন ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে। ড. রিয়াজুল হক তাঁর *মরমী কবি 'পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য'* নামক গ্রন্থে পাঞ্জু শাহ্‌র গানগুলোকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।[২৯]

১. আল্লাহ তত্ত্ব
২. রাসুল তত্ত্ব
৩. সৃষ্টি তত্ত্ব
৪. মুর্শিদ তত্ত্ব
৫. দেহতত্ত্ব
৬. মানুষ তত্ত্ব
৭. প্রেম তত্ত্ব
৮. পরমতত্ত্ব
৯. পারাপার তত্ত্ব
১০. সংসার ও সমাজ তত্ত্ব
১১. ঘেরকাতত্ত্ব
১২. গোষ্ট ও অষ্ট তত্ত্ব

পাঞ্জু শাহ রচিত দুটি গান নিচে উপস্থাপিত হলোঃ

প্রথম গানঃ

শোনরে মন রসনা যদি কর প্রেমের বাসনা
ভক্তি মূল্যে না কিনিলে, অমূল্য প্রেম পাবে না ॥
সাধু শাস্ত্রে গেল জানা, প্রেম প্রাপ্তির উপায় ভক্তি
ভক্তি চেনা গেলা না,
কিরূপ ভক্তি কি আকৃতি, জানলে হয় উপাসনা ॥
শুনি ভক্তি এই পদার্থ, অহং না থাকিলে, তিনি এই ব্রহ্মান্ড শুনিত,
কি জন্য অহং আশ্চর্য করে তার প্রবঞ্চনা।
ভক্তি কোথায় হয় উৎপত্তি, উর্ধ কি হয় অধঃগতি
কোথায় বারমখানা।
ভক্তি সৃষ্টিকর্তা যেজন, সেবা হয় কেমন জনা ॥
ভক্তি চিনে করা সাধ্য ভক্তি দেশে সাঁই এসে, প্রেমের সে হয় বাধ্য,
হীরু চাঁদ কয় অধীন পাঞ্জ, মানব দেহে দেখ না ॥[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় গানঃ

জাতির বড়াই কি ইহকাল জাতি করে কি
আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জাতের মুখি।
এক জাতের বোঝা লয়ে, চির কাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে,
মানের গৌরব কুলের গৌরব, ধন্ধবাজী সব দেখি ॥
লোকে পেটের দায়ে দেশান্তরী হয়,
হিন্দু-মুসলমানের বোঝা মাথায় করে রয়,
কার বা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি
জেতে অন্ন নাহি দিবে, রোগে না ছাড়িবে,
পাপ করিলে কোম্পানি সব জাত ধরে লয়ে যাবে,
মৃত্যু হলে যাবে চলে, জাতির উপায় হবে কি ॥
মন ডাক আললাহ, কুলের গৌরব ফেলে ,
মালেক আললাহ বলে, তাইরি লেহ চিনে,
পাঞ্জত বলে যত করলাম সকলি ফাঁকি জুকি ॥[৩১]

বাউল গান রচনায় পাঞ্জু শাহ বিশেষ একটি নাম। বাউল সাধনা ও বাউল গানে সাধক পাঞ্জু শাহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত গান সমূহ বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র ও ইতিহাস। এই সাধক পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে খোরকা বা ফকিরি পোশাক পরিধান করেন। তখন থেকেই তাঁর পূর্ণ সাধক জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর সহজ সরল সত্য নিষ্ঠ জীবন যাপনের মাধ্যমে সাধক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং রচিত গানের মধ্য দিয়ে জীবন জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। বাংলার এই সাধক ও লোককবি ১৯১৪ (বাংলা ২৮ শ্রাবণ, ১৩২১) খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

করিম শাহ একজন সমাজ সংস্কারক ও সংগঠক ছিলেন। তিনি ফকির করম শাহ নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন জনদরদী ও লোকপ্রিয় একজন মানুষ। ফকির করিম শাহ ১৭৭৬ খ্রি. সুসঙ্গ পরগনায় আসেন এবং সেখানকার গারো ও হাজং সমাজে সাম্যভাবমূলক বাউল ধর্মে দীক্ষা দান করা শুরু করেন। বাউল সাধক করিম শাহ অত্যাচারিত গারো এবং হাজংদের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাদেরকে এক সর্বজনীন সাম্যনীতিতে সংগঠিত করেছিলেন। ধারণা করা হয় করিম শাহ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাউল করিম শাহের গানের বিষয়বস্তু ছিল সাম্য এবং মৈত্রী। তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করতেন এবং তিনি অনেককেই বাউল মতে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকল আদিবাসী একত্রিত হয়ে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সৃষ্ট বাউল দলকে তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'পাগলপন্থী' বলে আখ্যা দেয়। পাগলপন্থীদের আবির্ভাব বাংলা ও বাঙ্গালীর লৌকিক ধর্মসাধনার ইতিহাসে একটি বিশেষ ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে আচরিত হয়ে আসছে। পাগলপন্থীদের গ্রন্থে এই লৌকিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা করিম শাহকে দরবেশ আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে দরবেশ শব্দের সমার্থক। 'পির' বা 'দরবেশ' সুফি মার্গের সাধক।[৩২]

এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় লিখিছেন:

> "বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হইবার পর, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে করিম শাহ নামক এক ফকির সুসঙ্গ পরগণায় আসিয়া এই অঞ্চলের গারো ও ও হাজংদিগকে সাম্যমূলক 'পাগলপন্থী বা বাউল ধর্মে' দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ধর্মের মূল বিষয়বস্তু ছিল সত্যনিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। অল্পকালের মধ্যে জমিদার গোষ্ঠীর দীর্ঘকালের উৎপীড়ন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ গারো ও হাজংগণ এই নতুন ধর্মমত গ্রহণ করিয়া করিম শাহ ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং এই সাম্যমূলক নূতন ধর্মমতে বলীয়ান হইয়া শোষণ-উৎপীড়নের বিরূদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে।"[৩৩]

করিম শাহ যে সকল নীতি প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সংস্কারের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নীতিতে উপবাস বা রোজার কোন প্রকার বিরোধিতা করা হয়নি। পাগল সম্প্রদায় দিনে রাতে কঠোর উপবাস করত। সন্ধ্যা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা উপবাস ভাঙত না। করিম শাহ মনে করতেন, ইন্দ্রিয়সংযম, পরনিন্দাবর্জন এসকল সদাচরণ না পালন করলে উপবাস করা নিরর্থক। করিম শাহের জীবনকাল আনুমানিক ১৭৪০ অথবা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর সংগ্রামী জীবনের ব্যাপ্তি ১৭৭৫ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ।ধারণা করা হয় ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে করিম শাহ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী বাউল সাধক। বাউল সাধনায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন।[৩৪]

করিম শাহের পুত্রের নাম টিপু শাহ বা টিপু পাগলা। তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিরোধী আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব। তিনিও একজন 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহী ছিলেন। পিতার পরলোক গমনের পর টিপু শাহ বা টিপু পাগলার নেতৃত্বে গারো জনগণ ইংরেজ ও জমিদারদের অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সচেষ্ট হয়ে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৩৫]

বাউল সাধক শিতালং শাহ্ প্রকৃত নাম মোহাম্মদ সলিমউল্লাহ। তাঁর ফকিরি নাম শিতালংশাহ। এটি একটি ফারসি শব্দ। যার অর্থ পায়ের গোড়ালির গোল হাড় বিশেষ। তাঁর পিতার প্রকৃত নাম জাঁহা বক্‌শ আলী এবং ফকিরি নাম কামাল শাহ্। শিতালং শাহ'র জন্ম তারিখ নিয়ে ভিন্ন মত প্রচলিত। ধারণা করা হয় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বাংলা ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৬। ইংরেজি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় মৃত্যুর সময় তাঁর আনুমানিক বয়স ছিল ৯০/৯৫ বছর। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে তাঁর জন্মকাল ১৭৯৫ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হবে। তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বদরপুর থানার শ্রীগৌরী মৌজার কিত্তাশিলাচর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মবাদের কবি। সংসারত্যাগী এই বাউল সাধক রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিনশতাধিক। কবি নিজেই তাঁর কাব্য ভাষায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

শিতালং নাম মোর গুণাহ বেশুমার

কৃপা যদি করআল্লাহ করিম গফফার ।

মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ দোষগুণে মাজুর

Dhaka University Institutional Repository

জাঁহা বকশ আলী নাম পিতার মাশুর।

পরগণে চাপঘাট মোর পয়দিশ সেথায়

শ্রীগোরী মৌজায়েতে, শিলচর কিত্তায়।[৩৬]

শীতালং শাহ তাঁর গানে আধ্যাত্মচেতনা, সমাজচেতনা, সমন্বয়চেতনা এবং শ্রেণীদ্বন্দের চেতনা প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। তিনি গৃহতাগী হয়ে সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। তিনি একজন গুরুবাদী সাধক। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন:

শীতালং ফকির কয় ভাবি নিরঞ্জন,
দুনিয়া আখেরে জান মুর্শিদ বড় ধন।[৩৭]

সাাধক শীতালং শাহ সাধনার জগতে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের কোন ভেদাভেদকে স্থান দেননি। তিনি উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলো বাউল সাধনা ও গানের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তিনি তৎকালীন সমাজকে উদার মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবলোকন করেছেন।[৩৮]

দুদ্দু শাহ্ লালন শাহ্র প্রিয় শীষ্যদের মধ্যে অন্যতম একজন। দুদ্দু শাহ্র জন্মস্থান সম্পর্কে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'দুঃখের বিষয় বাংলার কোন অংশে তাঁর বসত ছিল, তাহা জানা যায় না।' তবে তিনি অনির্দিষ্ট করে বলেছেন কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ কিংবা রাজবাড়ি কোনো এক স্থানে তাঁর বসত বাড়ি ছিলো।[৩১] দুদ্দু শাহর জন্মকাল নিয়েও কিছুটা মতবিরোধ প্রচলিত আছে। তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন,"তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অর্থাৎ ১৮৫০-১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের লোক বলিয়া মনে হয়।"[৩৯]

লালন শাহ্র অন্যতম শিষ্য হিসেবে দুদ্দুর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। তৎকালীন লোকসমাজে লালন যখন প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং তাঁর খ্যাতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, ঠিক সেই সময়ে দুদ্দু শাহ্ লালনের শিষাত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি লালনের অন্যতম একজন শীষ্য হয়ে উঠলেন। তিনি লালনের চেতনা ও দর্শনকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর গানে গুরু হিসেবে লালন শাহ্কে নির্দেশ করেছেন এবং তাঁর গুণকীর্তন ও আদেশ-নিষেধের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর জীবন ও সাধনায় কোন প্রকার কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত অন্ধত্ব স্থান পায়নি। তিনি দৃঢ়চেতা ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচনায় সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪০]

ধলা-কালার একই বীজ ভাই
সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র আখ্যা পাই।
দীন দুদ্দু বিনয় করে কয়
আমার কোনো জাতি গোত্র নাই
দিয়ে মানুষের দোহাই মানুষের গুণ গাই।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

বাউল সাধক দুদ্দু শাহ্‌র বাউল দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যছিল। বাউল সাধকগণ দেহকে কেন্দ্র করে দেহের মধ্যেই সাধনা করেন। তাঁর রচিত বাউল গানে লালন প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, যোগ ও তান্ত্রিক ভাবধারা থেকে গান রচনার উপাদান খুঁজেছেন। নিম্নে উল্লেখিত গানটিতে বাউল সাধনার মর্মবাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে।

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খোঁজে পায় তাঁর উল
পূর্ব পুনঃজন্ম না মানে, চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে হয়রে মুকবুল।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ- ১৩৭-১৩৮
২. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-১৪
৩. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৮
৪. উদ্ধৃত, মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৪৮
৫. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৮
৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৪৬
৭. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৯. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি* পদাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ- ১৮,২৩
১০. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৪৭
১১. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২৩
১২. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৫০
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৬. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮
১৮. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ-৪৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২০. লাবণী অধিকারী ও সানিতা তাবাসসুম, *লোককবি ও লোক বাদ্যযন্ত্র*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ২০১৯, পৃ. ১৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২২. মোস্তাক আহমাদ, *লালন জীবন ও দর্শন*, বাঁধন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৩৭
২৩. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৯,১৬০
২৪. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২,পৃ. ৪
২৫. আব্দুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩৮
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
২৭. উদ্ধৃত, আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩৬
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
২৯. ড. রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫১
৩০. লাবণী অধিকারী ও সানিতা তাবাসসুম, লোককবি ও লোক বাদ্যযন্ত্র, সংস্কৃতি প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ২০১৯, পৃ. ৩৬
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৩২. ড. রিয়াজুল হক, মরমী কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৭৮
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৩৪. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪৮-১৫০
৩৫. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
৩৯. উদ্ধৃত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কপকাতা, ১৯৫৭,পৃ. ৮০৭
৪০. এস. এম লুৎফর রহমান, *দুদ্দু শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯,পৃ. ১২
৪১. আব্দুল ওয়াহাব, বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৭০
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বৌদ্ধ সহজিয়া গান ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এই দুই ধারার গীতরীতির গুরুত্ব ও প্রভাব বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি। বৌদ্ধ সহজিয়া গান আমাদের বাংলা সংগীতের শেকড়। এই বিশেষ ধারা প্রসূত আরেকটি গীত শৈলী হল বাউল গান। বাউল গান আমাদের বাংলা সংগীত তথা বাংলা লোকসংগীতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ধারা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় বজ্রযান, বজ্রকুল, বজ্রতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গান বা চর্যাগীতি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের সাধনার ফসল। এ বৌদ্ধ সহজিয়া গানের ভাব, প্রকরণ ও তত্ত্বের সঙ্গে বাউল গানের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়ায় যায়। বাউল গানকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য বলা যেতেই পারে।

সহজিয়া সাধনায় যৌগিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। কায়াসাধনাই হল মূলত বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান সাধনা। দেহকে অবলম্বন করেই সাধনা করতে হবে যাতে পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সহজ সাধকগন দেহকে ভিত্তি করেই ধর্ম ও সাধনার তত্ত্বের প্রতিপাদন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। একজন সাধকের পরম আরাধ্য বিষয় হল বোধিচিত্ত বা মহাসুখ। সাধনার মাধ্যমে প্রজ্ঞারূপ শূন্যতা এবং উপায়রূপ করুণার সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলেই এই সহজানন্দ বা মহাসুখ লাভ করা যায়। দেহের অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনেই সহজানন্দের অনুভব পাওয়া সম্ভব। বাউল সম্প্রদায়েও এই সহজিয়া ক্রিয়ার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সহজিয়া সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নিয়ে চলে এই ক্রিয়া প্রক্রিয়া। বাউল সাধকগণ যাকে দমের খেলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। লালনসাঁই বলেছেন;

সপ্ত তলা ভেদ করিলে হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়

হাওয়ার ঘরে গেলে পরে অধর মানুষ ধরা যায়।

বাউল গানের সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়া ও গুরু প্রধান। বৌদ্ধ সহজিয়া গানেও গুরুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বাউল সাধকগণ হৃদয়ের পরম সত্তা, পরম ইচ্ছা, পরম চিন্তা ও পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করে সেই পরম সুন্দর বিভিন্ন রূপক বা উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। বাউল গানে যেমন বৌদ্ধ সহজিয়া ও সূফী-তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে তেমনি হিন্দু তন্ত্র, বৈষ্ণব সহজিয়া গুরুবাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বাউল সাধনা হল দেহ ভিত্তিক এমন এক অধ্যাত্ম সাধনা যেখানে মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে বন্ধনহীন সম্পর্ক গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন গুরু, পীর বা মুর্শিদ। বৌদ্ধ সহজিয়া গান ও বাউল গানের তুলনামূলক আলোচনায় কিছু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও সাধন তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব বাউল গানের সাধন তত্ত্বে রয়েছে। যদিও বাউল গানে সূফীমত, বৈষ্ণবমত এবং নাথপন্থা প্রভৃতি ধারার প্রভাব পাওয়া যায়।

বাউল গান মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া গানেরই নব্য সংস্করণ। বাংলা সংগীতে বৌদ্ধ সহজিয়া গান উৎসারিত হওয়ার মাধ্যমেই বাউল গানের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া গানের দেহ সাধনার ধারা বাউল গানেও চর্চিত, রক্ষিত ও বিকশিত হয়ে আসছে। সুতরং বলা যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া গান থেকেই বাউল সাধনা ও গান পরিণত ও উন্মীলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অতীন্দ্র মজুমদার : *চর্যাপদ*, বুক ল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৭৩

অনুপম হীরা মণ্ডল : *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০১০

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬

আহমদ শরীফ : *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৭৩

: *বাংলা সূফী সাহিত্য*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

আনোয়ারুল করিম : *বাউল কবি লালন শাহ*, নওরেজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩

আবুল আহসান চৌধুরী : *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ২০১৭

আব্দুল ওয়াহাব : *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন প্রথম খণ্ড*, একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, দ্বি-স, কলকাতা, ১৩৭৮

এবাদত হসেন : *চর্যা-পরিচিতি*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭০

এস. এম লুৎফর রহমান : *দুদ্দু শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

ওয়াকিল আহমদ : *বাউল গানের ধারা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

করুণাময় গোস্বামী : *বাংলা গানের বিবর্তন প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া : *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

ডক্টর আনোয়ারুল করীম : *বাংলাদেশের বাউল সমাজ*, সাহিত্য ও সংগীত, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

ড. নির্মল দাশ : *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

ড. মো. আব্দুল করিম মিয়া : *(সম্পাদিত) বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন প্রথম খণ্ড*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫

ড.রিয়াজুল হক : *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ*: জীবন ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা : *(সম্পাদিত) চর্যাগীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭

মোহনকালী বিশ্বাস : *গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের কারণ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭

মাহবুবুল আলম : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৯

মুহম্মদ এনামুল হক : *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, কোলকাতা, মহসীন এন্ড কোম্পানী, ১৯৬৮

মোবারক হসেন খান : *বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

মোস্তাক আহমাদ : *লালন জীবন ও দর্শন*, বাঁধন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮

রায়হান রাইন : *(সম্পাদিত) বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৭০

শামসুজ্জামান খান : *(সম্পাদিত) বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাকচি : *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৫২

সৈয়দ আলী আহসান : *চর্যাগীতিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

সুমন শিকদার : *(সম্পাদিত) বাউল ভাবনা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

সুকুমার সেন : *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : *(সম্পাদিত) হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলকাতা, ১৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্নদাশংকর রায় : *লালন ফকির ও তাঁর গান,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড*, কোলকাতা, ১৩৯৮

অধীর বাগচী : *বাঙলা গান- এগারোশো বারশো শতক*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৮৮

আনিসুজ্জামান : *(সম্পাদিত) বাংলা সাহিত্যের*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৭

আশরাফ সিদ্দিকী : *লোকসাহিত্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৪

ওয়াকিল আহমদ : *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০

করুনাময় গোস্বামী : *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

ড. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি : *বাংলাগানের* ঐতিহ্য বিষয় ও রূপবৈচিত্র্য, মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, ২০১৪

বরুণ কুমার চক্রবর্তী : *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৩

পূর্ণদাস বাউল : *বাঙলার বাউল গান*, কথাভারতী, কোলকাতা, ১৯৯৮

বিশ্বজিত ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *(সম্পাদিত) বাউল গান ও দুদ্দু শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১

ভিক্ষু সৃনীনাথ : *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

মাহমুদা খানম : *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-সূফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

মুহম্মদ এনামুল হক : *বঙ্গে সূফী প্রভাব, মহসীন এন্ড কোম্পানী*, কোলকাতা, ১৯৬৮

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : *নতুন চর্যাপদ* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকাঃ

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : 'লালন শাহ ও আত্মদর্শন', খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, লালন সাহিত্য ও দর্শন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

অধ্যাপক মোহাম্মদ গলাম রসুল : 'সূফীবাদ ও লালনগীতি', খোন্দকার রিয়াজুল হকসম্পাদিত, লালন সাহিত্য ও দর্শন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

আব্দুল কাদির : 'সূফী ও বাউল পদাবলী', খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, লালন সাহিত্য ও দর্শন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

আমিনুল ইসলাম : 'বৈষ্ণব দর্শন ও মানবতাবাদ', ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, বাঙ্গালীর দর্শন চিন্তা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২

লীনা চাকী : 'বাউল সঙ্গিনী- মহিলা বাউল', সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, লোকসংস্কৃতিগবেষণা পরিষদ, কোলকাতা, ১৯৯৫

শাহ লতীফ আফী আনহু : 'বাউল গানের মানুষ শব্দের ব্যাখ্যা', সিকান্দার আবুজাফর সম্পাদিত, সমকাল, ৩য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা১৩৬৭

সনৎ কুমার মিত্র : 'বাউল ফকির সূফী',সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত,বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, লোকসংস্কৃতিগবেষণা পরিষদ,কোলকাতা, ১৯৯৫

সুধীন্দ্রনাথ মিত্র : 'বাউল', সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, বাউললালন রবীন্দ্রনাথ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,কোলকাতা, ১৯৯৫